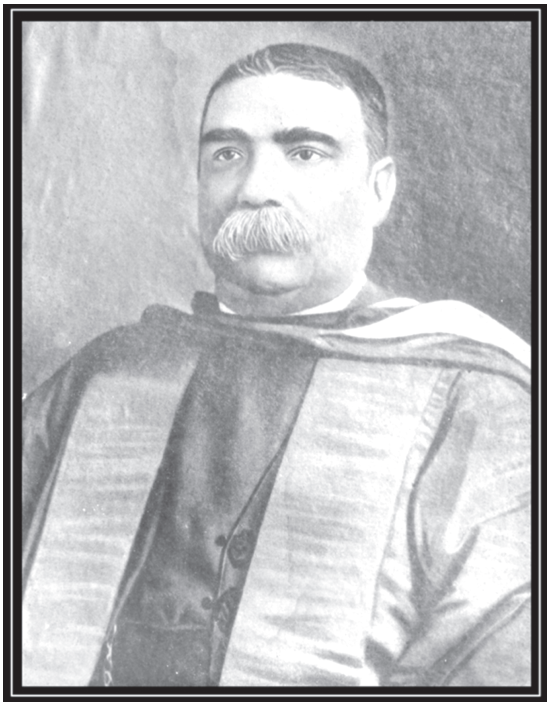

প্রয়াণ শতবর্ষে আশুতোষ
একটি মূল্যায়ন

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

মধ্যযুগীয় দেবনির্ভর সংস্কারাচ্ছন্ন আবহাওয়া যখন দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছিল তখন উনিশ শতক নতুন মননশীলতার আলোয় বঙ্গদেশকে ঋদ্ধ করেছে। নবজাগৃতির উনবিংশ শতক প্রথমার্ধে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বা বঙ্কিমের মতো অসামান্যদের যেমন জন্ম দিয়েছে, তেমনি দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ বা আশুতোষের মতো মহামানবদের হাতে নিজেই সমৃদ্ধ হয়েছে। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের প্রায় সমসময়ে আবির্ভূত হন আশুতোষ (১৮৬৪–১৯২৪)। অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের মতো বহু আলোচিত বা চিত্রিত হয়ে সর্বত্র বিদ্যমান নন। একটু 'লো-প্রোফাইল' এই মানুষটির জীবনও তাঁদের থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিদ্যালয়ছুট নন তিনি, নরেন্দ্রনাথের মতো দুরন্ত প্রকৃতি সেখানে অনুপস্থিত। দুজনের মতো তিনি সমুদ্র ডিঙিয়ে পশ্চিম-যাত্রীও হননি। সুবোধ বালক হওয়ার জন্য গোপালকে বিদ্যাসাগরমশাই যে যে কারণে পছন্দ করতেন, বালক আশুতোষের মধ্যে সেই গুণগুলি হয়তো একটু বেশিমাত্রায় ছিল। পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিন সন্তানের অগ্রজ আশুতোষকে ছোটোবেলা থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার জন্য অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর অংশবিশেষ নিখুঁত মুখস্থ বলার জন্য ছেলেকে উৎসাহিত করে পুরস্কার দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষায় ভালো ফল করলে উৎসাহবর্ধনের জন্য যে অর্থ দিতেন, তা

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

জমিয়ে কিশোর আশুতোষ নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

প্রথাগত বিদ্যাচর্চার জন্য তীব্র আকুতি কখনো কখনো তাঁকে শারীরিকভাবে অশক্তও করে তুলত। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী আশুতোষ মাত্র ষোলো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি Theorem-এর সমাধান করে যে প্রবন্ধ বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, তা 'Cambridge Messenger of Mathematics'-এ ছাপা হয়। সিমলেপাড়ার অগ্নিপ্রভ বালকের মতো তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে বাল্যকালে ভাবিত হননি। বরং বাবার নির্দেশিত পথকে, মর্যদাযুক্ত উন্নয়নকেই প্রাধান্য দিয়েছেন শিউলি শৈশব থেকে। প্রচলিত পাঠক্রমকে আত্তীকরণ করেছেন সর্বোচ্চ দক্ষতায়। গণিতশাস্ত্র ও আইন দু'ক্ষেত্রেই তুল্যমূল্য জ্ঞানের অধিকারী উনিশ শতকের এই মেধাবী মানুষটিকে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ থেকে ভারতবর্ষের বৌদ্ধসঙ্ঘও নানা উপাধিতে ভূষিত করেছে। তাঁর নামের পর প্রাপ্ত উপাধিগুলি যোগ করলে এরকম দাঁড়ায়---Sir Ashutosh Mukherjee, Saraswati Sastravachaspati, Sambuddhagama Chakrabarty, Kt. C.S.I., M.A., P.R.S., D.L. Ph.D, F.R.A.S., F.R.S.E।

১৯০৪ থেকে ১৯২৩ দীর্ঘ কুড়ি বছর কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি থাকার সময় দু'হাজারের বেশি মামলার রায় দিয়েছেন। আইনের সূক্ষ্মদৃষ্টি, গভীর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এক্ষেত্রে সহায়তা করত বলে তাঁর বিচার-পদ্ধতি নিছক গতানুগতিকতার পথে চলেনি। বিচারক আশুতোষ বিস্ময়। কিন্তু বাঙ্গালির হৃদয়বৃত্তিতে তিনি শুধু এ কারণে স্মরণীয় নন। তীব্র স্বাভিমান, তেজোদীপ্ত আচরণ তাঁকে বাঙ্গলার বাঘে পরিণত করেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা থেকে 'বাঙ্গলার বাঘ' অভিধা সম্পর্কে একটা তথ্য পাওয়া যায়। ডাকাবুকো চেহারার ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেঁশোর ছিল ঘন চওড়া গোঁফ। অত্যন্ত সাহসী, বলদর্পী ফরাসি প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঈর্ষণীয় গোঁফের জন্য ফরাসি বাঘ বলে বিবেচিত হতেন। ফরাসি রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আশুতোষের পৌরুষদীপ্ত চেহারার সাদৃশ্য দেখে অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁকে 'বাঙ্গলার বাঘ' অভিধায় ভূষিত করে। রয়্যাল বেঙ্গলের রাজকীয় প্রাণবন্ত রূপ, শক্তির প্রাচুর্য এই বঙ্গ শার্দূলের মধ্যেও পুরোমাত্রায় ছিল। বাঙ্গলার বাঘ অবশ্য আরণ্যক পটভূমিতে নয়, মননশীল নাগরিক মনোভূমিতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তবে এ সমস্তই নানা আশুতোষের একটি পর্যায়মাত্র। বাঙ্গালি তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে বিদ্যানাগরিক হিসেবেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হলেও ১৯০৪ সালের আগে পর্যন্ত তা নিছক পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। পরীক্ষার রীতি নির্দেশিকা, পরীক্ষার্থীদের সম্যক পরিচয়, অধীন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা তথ্য, প্রশ্নপত্র নির্মাণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ ইত্যাদি নিয়েই সিনেট-সিন্ডিকেটে আলোচনা হতো। বড়লাট বৎসরান্তে উপাধি বিতরণের মহোৎসবে আচার্য হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বাড়াতেন মাত্র।

আশুতোষের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষক ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষলগ্নে সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে এঁদের আগে সুদীর্ঘকাল ধরে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি হলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৯ থেকে আমৃত্যু ছিল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ। ১৮৭৯-তে সেনেটের সদস্য, ১৮৮৫-তে সিন্ডিকেটে প্রবেশ, ১৮৯০–৯২ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর আগে কোনো ভারতীয় উপাচার্য হননি।

কার্জন বড়লাট হওয়ার পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও বটে। তাঁর আমলে 'The University Act-1904' প্রচলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নতুন যুগের আলো নিয়ে আসা বিধিবদ্ধ এই আইনে ঠিক হয় নিছক পরীক্ষাগ্রহণ নয়, পঠন পাঠনেও বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় ভূমিকা নেবে। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবক হওয়ার জন্য কার্জন বহু নিন্দিত হলেও এদেশে বেশ কিছু যুগান্তকারী কাজ করেছেন তিনি। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা। বিকেল চারটের সময় আশুতোষ আইনের জটিল জগৎ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। অবৈতনিক এই উপাচার্য রাত্রি আটটা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন এই শিক্ষাক্ষেত্রকে বিশ্বমানের উৎকর্ষ প্রদান করার জন্যে। কাগজ খুললেই এখন শিক্ষানিধন যজ্ঞের খবর। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন। ১৯০৭ সালে উপাচার্য হিসেবে তাঁর প্রথম সমাবর্তনে তিনি যা বলেছিলেন আজকের বিনষ্ট আবহাওয়ায় তা পুনরুচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে—"Sound education should be imparted and discipline should be enforced in all schools."

কৃতবিদ্য আশুতোষ নব-নালন্দা তৈরি করতে চাইলেন জ্ঞানের জগতের উৎকৃষ্টদের সসম্মানে নিয়ে এসে। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিপুল দানের উপর নির্ভর করে সার্কুলার রোডে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স। রসায়নে অধ্যাপনার জন্য এলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন। আশুতোষের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। নিয়ে এলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। বাংলাভাষায় অভিসন্দর্ভ প্রকাশের ব্যবস্থা হয় তাঁরই সময়। মায়ের নামে যে 'জগত্তারিণী পদক'-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় আজও। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বও কিছু সময়ের জন্য বাংলা বিষয়ের হেড একজামিনার হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে আসেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো জ্ঞানতাপসেরা।

তিনি চিনতেন প্রতিভার দ্যুতি। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক

হিসেবে যিনি জগদ্‌বিখ্যাত হবেন সেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন বাংলা এম.এ. পাশ করেন, তখন আশুতোষ তাঁকে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। সুনীতিকুমার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—''সবে পাশ করেছি আর একেবারে এম.এ. ক্লাসে পড়াতে হবে। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, পারব কি? তিনি অমনি একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পারবে না কেন? যেটুকু পড়েছ সেটুকু তো ভালো করেই পড়েছ। তবে আর ভয় কীসের? সেই দিন তাঁর কাছে ঐরকম উৎসাহ পেয়েই তো অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলাম।''

ইংল্যান্ড, গ্রিস, ইতালির ইতিহাস এবং তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে আশুতোষ সচেতন ছিলেন। আশুতোষ চাইতেন অতীত ভারতের গৌরবময় ফেলে আসা সময় নিয়ে ভারতীয়রা নতুন করে আলোচনা করুন। আমরা কোনো অংশেই জগৎ সভায় অচ্ছুত নই—সেই বোধ তাঁর ছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী গবেষক ও অধ্যাপকরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে অলংকৃত করেছিলেন।

অসম্ভব ছাত্রদরদি ছিলেন বঙ্গশার্দূল। প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্বে থাকা অধ্যাপকদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন, প্রশ্নের জটিলতায় পরীক্ষা যেন ছাত্রমেধ যজ্ঞে পরিণত না হয়। একবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্ন পণ্ডিত অধ্যাপক মশাই তৈরি করে এক ছুটির রবিবার আশুতোষের বাসভবনে যান জমা দিতে। প্রশ্নে দু'একবার চোখ বুলিয়ে উপাচার্য তাঁকে সবিনয়ে বলেন, প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর যেন তিনি খাতায় করে দেন। আড়াই ঘণ্টা লাগে কৃতবিদ্য অধ্যাপকের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে। স্মিত হেসে আশুতোষ তাঁকে বলেন আপনার মতো পণ্ডিতের যদি এত সময় লাগে তাহলে সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা কী দাঁড়াবে। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রশ্নপত্র ছাত্রের মেধা অনুযায়ী হওয়া উচিত, পণ্ডিত অধ্যাপকের জ্ঞানের আকর হিসেবে নয়।

তাঁর উপাচার্য হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে প্রশ্নপত্রে বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ থাকত না। তিনিই বিকল্প রীতির ব্যবস্থা করেন। নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও উদার হওয়ার পরামর্শ দিলেন। ফলে পরীক্ষায় সফল হওয়া ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

আশুতোষের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন পুত্র ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৪-এর ২৫ মে আশুতোষ প্রয়াত হলে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হন। ১৯৩৪-৩৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বাবা আশুতোষের মেধাবী সত্তা সক্রিয়

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি—বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

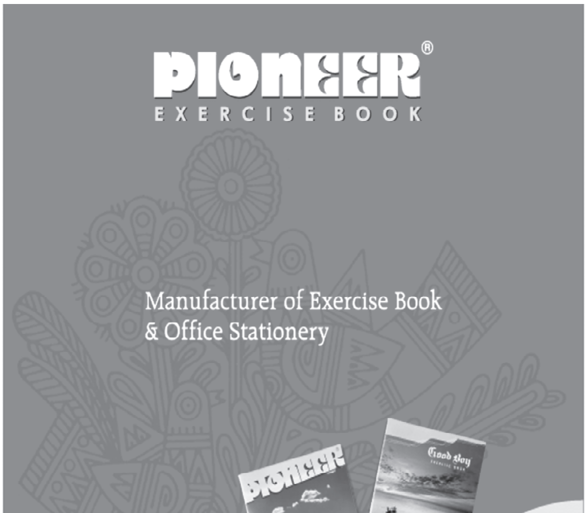

ছিল বলেই শ্যামাপ্রসাদ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোরের কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের সক্রিয় সদস্য হয়ে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানের বিস্তারে যে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তার পেছনেও সক্রিয় থেকেছে আশুতোষের অবদান। প্রায় ২৬ বছর শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে পিতা আশুতোষের মতোই উৎকর্ষ সাধনে অনমনীয় ছিলেন। বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পিতা আশুতোষের প্রভাব তাঁর উপর অনির্বাণ ছিল বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নতুন রূপ দেন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাহুল্যহীনভাবে বলা যায়, পিতা আশুতোষের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ওজস্বী জনদরদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে গভীরভাবেই আবিষ্ট রেখেছিল আমৃত্যু।

রাজনৈতিক উগ্রতা অনেক সময় দৃষ্টিশক্তিকে সীমিত করে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা উগ্র হতে চায়। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রুদ্ররসের প্রেক্ষিতে অন্ধ জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কেন তিনি সমসময়ের স্বদেশী আন্দোলনের তাপে নিজেকে সেঁকে নিলেন না, যে প্রশ্নও অনেক সময় অশোভন উগ্রতায় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু স্বাদেশিকতার উচ্চনিনাদ সরিয়ে যদি অন্তর্লীন দৃষ্টিতে তাঁর কার্যকলাপকে আমরা দেখি তাহলে এ জাতীয় সমালোচনার অসারতা স্পষ্ট হয়। বড়লাট লিটনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কাজ করার স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। "Freedom first, freedom second, freedom always." সমুদ্রতরঙ্গকে শাসন করার স্পর্ধা দেখানো ব্রিটিশ রাজশক্তির অমিত বারিপ্রবাহকে সেদিন একা রুদ্ধ করে দিয়ে আশুতোষ কি জাতীয়তাবাদীদের মনোবলকে বাড়াননি?

পরাধীন দেশের একসময় গৌরবময় এক ইতিহাস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী গবেষক, অধ্যাপক নিয়োগ করে হারিয়ে যাওয়া সোনালি অতীতকে তুলে এনে তিনি জাতীয়তাবাদীদের মনোবলকে স্ফীত করেননি কী? অশোক, সমুদ্রগুপ্তের মতো ক্ষমাশীল বীর সম্রাটদের সম্পর্কে নতুন করে চর্চার সূচনা করে তিনি কি ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার রসদ বিপ্লবীদের মধ্যে নীরবে সঞ্চার করেননি? বড়লাট লিটনের সঙ্গে বিরোধ তীব্রতর হলে ১৯২৪-এর ২৬ মার্চ এক চিঠিতে লিটনের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো লেখেন, তা তো শ্বেতদ্বীপের শাসনব্যবস্থাকেই যেন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়—

"আপনি যে অপমানসূচক প্রস্তাব করে আমাকে নতুন করে ভাইস চ্যান্সেলারের পদ দিতে চেয়েছেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি।"

এ দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের একাংশ মাতৃভাষার প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি অনুভব করতেন না। ইংরেজি ভাষার প্রতি উচ্চ ধারণা তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকত। এ ক্ষেত্রে আশুতোষ ছিলেন ভিন্ন ধাতুর। রাজভাষায় ঈর্ষণীয় ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পড়ার ও গবেষণার সুযোগ দিয়ে মাটির প্রতি তাঁর দায় শোধ করেন। বাস্তবতাবোধ প্রবল থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি যোগ্য ইংরেজ রাজপুরুষদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে গৌরবের শ্রেষ্ঠতম জায়গায় নিয়ে যান। ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষদের আশুতোষের ইংরেজ সংস্রব তত্ত্ব তাই একদেশদর্শী।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরবর্তীকালে যিনি পথিকৃৎ হবেন সেই সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক ওটেন লাঞ্ছনায় জড়িয়ে গিয়ে যখন বিপন্ন, তখন মেধাবী সুভাষকে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তির সুযোগ তো তিনিই দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বা স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যাঁরা অত্যন্ত যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন তাঁদের একাংশের পাঠগ্রহণ কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আক্ষরিক অর্থে মহীরুহ হয়ে ওঠে আশুতোষের হাতেই। কেন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে চোখাচোখা মন্তব্য করেননি— এই অভিযোগ করে তাঁর গায়ে জাতীয়তাবিরোধী তকমা যাঁরা লাগাতে চান তাঁরা নিজেরাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্বারা তাড়িত। অবশ্য ক্ষুদ্রমনাদের এরকম রুচি বিগর্হিত মন্তব্য থেকে বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথও বাদ যাননি।

মানবিক আশুতোষ অতি ক্ষুদ্র সোফারের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে না দিয়ে তথাকথিত অভিজাত-অনভিজাতের লক্ষ্মণরেখাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারত-ভাবনারই পরিচয় দিয়েছিলেন, যা ইতিহাস বলেই বিবেচিত হবে।

আজকের সংকটময় সময়ে দাঁড়িয়ে যদি তাঁরই দেখানো পথে চলতে পারি তবেই পরিত্রাণ মিলবে। নিছক ঘটা করে উৎসব পালন করা বা স্মারক পুরস্কারের ব্যবস্থা করে সংকীর্ণ পথে পুনরাবর্তিত হলে ধ্বংস হওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। শিক্ষা বিশেষত উচ্চশিক্ষার জন্য যে সততা, দৃঢ়তা ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময়ে শিক্ষার উৎকর্ষতা ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে অব্যাহত রাখতে চাইলে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। উপাচার্য হিসেবে তাঁর শেষ সমাবর্তন ভাষণে এই চেতনাই উচ্চারিত হয়েছিল— "No human institution is so permanent as a university, Dynasites may come and go, political parties may rise and fall, the influences of men change but the unversities go on for even as seats of trust, powers and truth."

প্রয়াণের শতবর্ষে আশুতোষকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বাঙ্গালির স্মরণ করা উচিত। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় যে অতি দুর্যোগময় আবহ চলছে তার লজ্জা থেকে বাঁচতে গেলে আশুতোষের মতো দৃঢ়চেতা, নির্লোভ, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির সদর্থক ব্যক্তিত্ব আজ বড্ড প্রয়োজন।

রাখবি ঢেকে কুহেলিকায়

প্রবাল

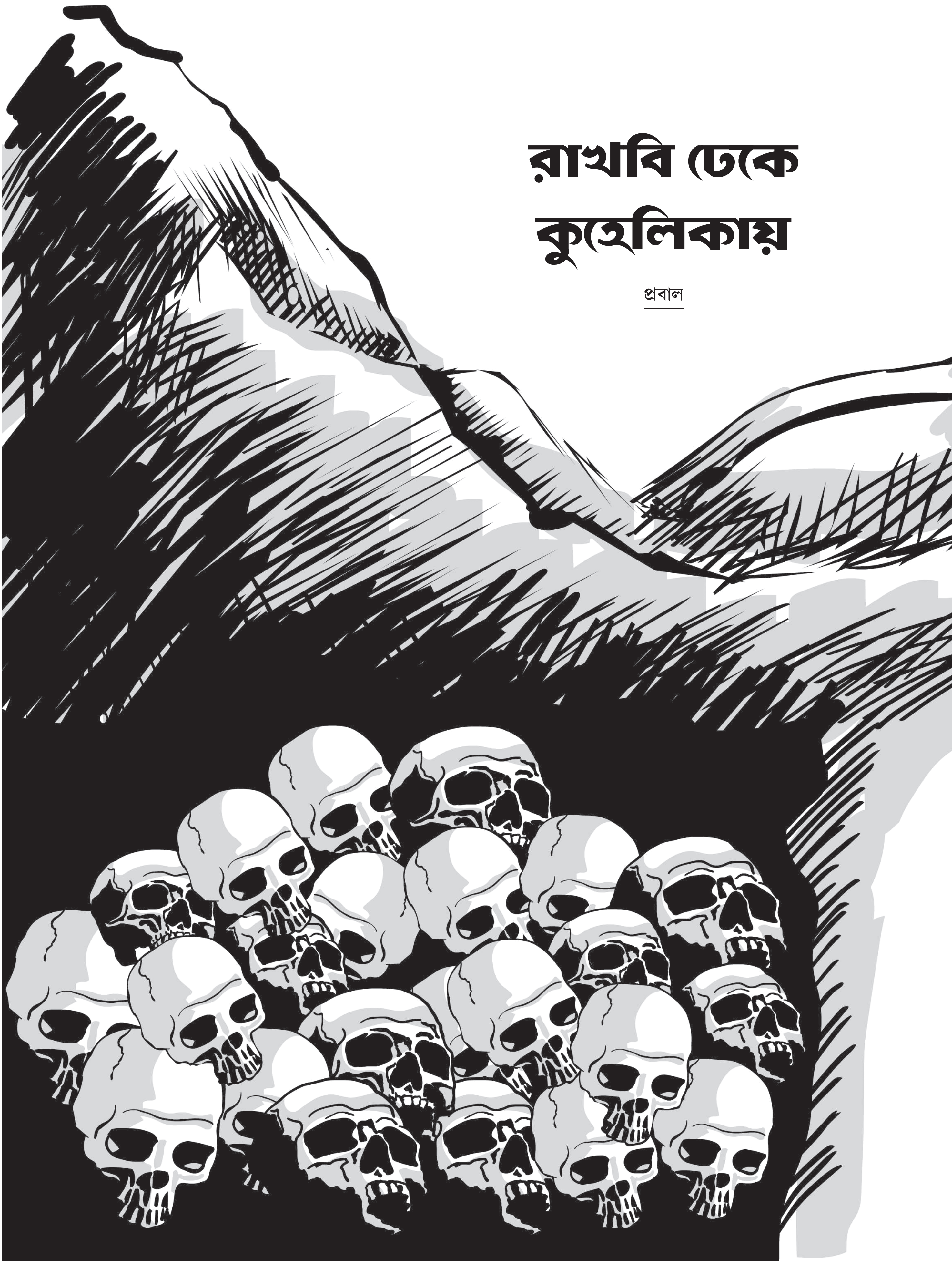

নার নার গুন!

অর্কর চোখ খুলল অসীম শূন্যতার অনুভূতি নিয়ে। কোথায় যেন এই জায়গাটা? বুকটা বড্ডো ফাঁকা লাগছে। শীত করছে। দম আটকে আসছে। অনেক নীচে একরাশ কুয়াশা পেঁজা তুলোর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশ ঝকঝকে নীল, তবু এত কুয়াশা কেন?

কুয়াশা নয়, মেঘ। এটা তো মেঘমুলুক। দূরে বিশাল একটা পাহাড় আকাশটাকে আড়াল করে রেখেছে। স্ফটিকের তৈরি এবড়োখেবড়ো পাহাড়, পলকাটা পানপাত্রের মতো শরীর থেকে নরম আলো ঠিকরোচ্ছে। খাঁজে খাঁজে আগুনের রং জ্বলছে।

সিঞ্জর পর্বত? নাহ্, ওটা তো হিন্দুকুশ।

উপত্যকা জুড়ে রাশি রাশি নরম বরফ। তার শেষপ্রান্তে সরু একটা পথ চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। সেই পথের ওপাশে গভীর খাদ। এখান থেকে দেখা যায় না, তবু অর্ক জানে, খাদটা ওখানে রয়েছে। খাদের গর্ভে অনেকগুলো টুকরো অতীত চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে। কিছুটা দূরে একগাদা পাথর জড়ো হয়ে স্তূপের আকৃতি নিয়েছে। স্তূপের কালচে পাথর থেকে গড়িয়ে পড়ছে সাদা বরফের আস্তরণ। যেন মহাপ্রস্থানের পথের প্রান্তে যমের দক্ষিণদুয়ার। চূড়া থেকে দড়ি ঝুলছে, একরাশ রঙ্গিন পতাকা উড়ছে সেই দড়ি থেকে। লাল, রানী, হলুদ, গেরুয়া, সাদা, নীল, সবুজ, তুঁতে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ও, মনে পড়েছে। এটা তো আফগান পামির, যাকে ভদ্রলোকে বলে ওয়াখান করিডোর। এক চিলতে জমি, ইংরেজরা আফগানিস্তানকে দান করেছিল ভারত থেকে পামির গ্রন্থিকে আলাদা

করতে। খাদের ধারের ওই রাস্তাটা বড্ডো চেনা। কুখ্যাত তালিবান সর্দার তেমির মুস্ত তার শত্রুদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ওই খাদের ধারে নিয়ে এসে ঠেলে ফেলে দেয়। ওই খাদে শুয়ে আছে অজস্র কঙ্কাল, পুরু বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে। না আফগান মুলুকের লোকেরা, না তাজিক মুলুকের লোকেরা— কেউ জানে না এই খাদটার কথা।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে দেখল অর্ক। নীল আকাশের বুকে সারিসারি শুধু পাহাড়। কালো পাহাড়, সাদা পাহাড়, মন্দিরের চূড়ার মতো। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। ঠিক যেন মস্তবড়ো তুলোট কাগজে জলরং দিয়ে কেউ একটা ছবি এঁকেছে। কুয়াশার স্তরের আনাগোনা মাঝে মাঝেই মুছে দিচ্ছে ছবিটাকে। কুয়াশা সরে গেলেই আবার কেউ যেন চট করে ছবিটাকে এঁকে ফেলছে। যতদূর চোখ যায় শুধু সেই ছবিটাই আছে, নীল ক্যানভাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ পর্বতশ্রেণী। যেন এক উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্র আর তার আকাশছোঁয়া অগুনতি ঢেউ, মাঝে বন্দি অর্ক। ঠিক যে মুহূর্তে ঢেউগুলো ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছিল ওকে, কোনো একজন জাদুকর মন্ত্রবলে সবকটা ঢেউকে থামিয়ে দিয়েছে। সময়কেও বুঝি থামিয়ে দিয়েছে সে জাদুকর।

না, সময় থামেনি। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ওই পতাকার শিকলিটা, ক্রমাগত উথালপাথাল করে। আর সাক্ষ্য দিচ্ছে আকাশের ওই তারাটা। এখন তো রাত নয়। তবে ওই তারাটা দেখা যাচ্ছে কেন? ভালো করে তাকিয়ে দেখল অর্ক। তারাটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। বদলাচ্ছে ওর রং। আগে ছিল অস্পষ্ট সাদা, ধীরে ধীরে তাতে লাগল হলুদের ছোঁয়া। এখন তারাটাকে ঘিরে আছে একটা উজ্জ্বল বেগুনিরঙের জ্যোতির্বলয়। আরও বড়ো হয়ে উঠেছে তারাটা।

দেখতে দেখতে তারাটা খুব কাছে এসে পড়ল, তারপরেই দুড়ুম শব্দ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। মোয়াব! মোয়াব! আর্তনাদ করে উঠল অর্ক। হঠাৎ মনে হলো, এটা যেন কোনো বলিউড সিনেমার শুটিং সেট, হোলির দৃশ্যের শুটিং চলছে। আচমকা একেক জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে লাল আবিরের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। আকাশের দিকে ছিটকে উঠছে রাশি রাশি লাল আবির। বিস্ফোরক আর ধোঁয়ার কটু দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। আবির নয়, লাভা। মাটির গভীর থেকে লাভা বেরিয়ে আসছে অজস্র ছিদ্রপথে। তার সঙ্গেই বাতাসে যেন আগুন ধরে গেছে। আশেপাশের পাহাড়গুলোতে কি প্রাণের সাড়া জাগলো? জাদুকরের মন্ত্রের মেয়াদ ফুরিয়েছে। স্থির পর্বতমালা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। খাঁচা ছাড়া বন্য জন্তুর মতো রাগে ফুঁসছে, উন্মত্ত আঘাতে সব সৃষ্টিকে এবার ডুবিয়ে মারবে। কঠিন মাটি কোন জাদুতে জীবন্ত হয়ে গেল? সামনের প্রান্তরে হিল্লোল জেগেছে, মনে হচ্ছে ওটা মাটি নয়, সমুদ্রের জল। দূর থেকে একটা ঢেউ দ্রুত এদিকে এগিয়ে আসছে। যেমন করে সমুদ্রর তরঙ্গের ওপর চড়ে ছোট্টো ডিঙ্গিনৌকো উথালপাথাল করে, তেমন করেই রাশিরাশি পাথর উঠছে আর নামছে। নিমেষে ঢেউটা এসে আঘাত করল সেই স্তূপটাকে,স্তূপের পাথরগুলো আকাশে ছিটকে উঠল। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতোই পতাকার শিকলিটা উড়ে গেল আকাশে। একরাশ জ্বলন্ত লাভা ছিটকে উঠল আকাশের দিকে, বুঝি সূর্যটাকে ধরার স্পর্ধায়। বাহরাম বুড়ো! শেষ, সব শেষ! নার নার গুন!

কে? কে বলল নার নার গুন? নার নার গুন মানে কী?

ঘুম ভেঙে গেল। গলার কাছটা শুকনো লাগছে। তেষ্টা পেয়েছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে? রাস্তার পাশে একটা সবুজ ফলক এক দৌড়ে চোখটাকে ছুঁয়ে পেছনে চলে গেল। ফলকটাতে লেখা ছিল, নার নার গুন। একটু আগেও রাস্তার দু'ধারে ছিল মাঠ, কারখানা, গুদাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। এখন তার জায়গায় শুধু গাছপালা। হাতঘড়ির দিকে চোখ গেল অর্কর। সন্ধ্যে ছ'টা বেজে পনেরো। একটু আগেই তো মনে আছে, প্যাকেনহামেরের কাছে একটা পেট্রলভর্তি স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল, তখন ছ'টা বেজেছিল। লাগোয়া দোকান থেকে কাগজের বালতি ভর্তি মাছভাজা কেনা হলো। তার মানে কি মাত্র পনেরো মিনিট ঘুমিয়েছে অর্ক? তার মধ্যেই এত কিছু ঘটে গেল? কপালে হাত দিয়ে দেখল, ঘামে ভিজে গেছে। জামাটাও ভিজে গেছে ঘামে। ওয়াখান করিডোর। সিঞ্জর... না না... হিন্দুকুশ। বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ফেলল অর্ক।

''কী হলো রে? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলি কেন?'' গাড়ি চালাতে চালাতেই সুনন্দ প্রশ্ন করল।

''অ্যাঁ ...? ও না,'' অর্ক চমকে উঠল, ''একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।''

''ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করছিলি'', বলল সুনন্দ, ''কেঁপে কেঁপে উঠছিলি। তুই ঠিক আছিস তো?''

''ও কিছু না। একটা দুঃস্বপ্ন...''

''দুঃস্বপ্ন? বাঃ, ভালো।'' সুনন্দ বলল।

''দুঃস্বপ্ন, ভালো মানে? দুঃস্বপ্ন ভালো কী করে হয়?'' প্রশ্ন আত্রেয়ীর।

''আরে, দুঃস্বপ্ন হলো ভূতের গল্পের মতো!'' হেসে বলল সুনন্দ, ''যত খারাপ, ততই ভালো। তা, ঘুমের মধ্যে কী সব

বিড়বিড় করছিলি? ওয়াখান, মোয়াব, বাহরাম, তেমির মুষ্ট, আল কুর্দী...”

নার নার গুন থেকেই আশেপাশের প্রকৃতি বদলে গেছে। লম্বা লম্বা গাছ রাস্তার দু'ধারে দেওয়াল তুলে দিয়েছে। সে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে চাষের জমি।

গন্তব্য মেলবোর্ন থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যদিকে কুমেরু মহাসাগর, ৮০০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই জঙ্গলটা। ঘনবন, পাহাড়, নদী, জলা, মোহনা, জায়গায় জায়গায় অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। আর আছে ১০০ কিলোমিটার লম্বা একেবারে নির্জন এক সমুদ্রতট। ওরা সবাই মিলে বেড়াতে যাচ্ছে, এক সপ্তাহের জন্য। পথে একদিন লেকস এন্ট্র্যান্সে থাকবে। তালটা সুনন্দই তুলেছিল, যদিও গন্তব্য হিসেবে ক্রোয়াজিঙ্গলং অর্কর ফরমাশ। স্কুলের সহপাঠী অর্ক, এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে দশটা বছর কেটেছিল। ছোটোবেলার ফুচকা থেকে কৈশোরের ভয়েভয়ে লুকিয়ে বিড়িতে টান, প্রথম আর শেষবারের মতো, সবই একসঙ্গে। তারপর যে যার পথে হারিয়ে গেল। এই মধ্যবয়সে ফ্লিন্ডার্স লেনের সরু গলিতে আচমকাই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে, এতগুলো বছর পরে। মুটিয়ে গেছে সুনন্দ, মাথার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু অর্ক একটুও বদলায়নি। ধরে বেঁধে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সুনন্দ। এই শহরে ছোটোবেলার বন্ধু থাকতে হোটেলে থাকবে অর্ক? হতেই পাবে না।

মাসটা ডিসেম্বর, মেলবোর্নের বাতাসে ছুটির আমেজ। কোথাও একটা বেড়াতে যাওয়ার কথা তো হচ্ছিলই। সুনন্দ আর ওর স্ত্রী ইন্দ্রাণী, আদিত্য আর ওর স্ত্রী আত্রেয়ী, ওদের ছেলে গিনি। আর আছে তীর্থঙ্কর, ওর স্ত্রী নিকোল, ওদের মেয়ে রেশমি। গিনি আর রেশমি দুজনেই সমবয়সি, বয়স বারোর আশেপাশে। বিবু সুনন্দর ভাইঝি, বয়সে গিনি আর নিকোলের থেকে বেশ কিছুটা বড়ো, এবছর ডক্টরেট শুরু করেছে। আছে তীর্থঙ্করের মা, আর সুনন্দর বন্ধু প্রজ্ঞা। অর্ককে সেই পরিকল্পনায় শামিল করতে অসুবিধে হলো না, সবাই খুশিই হলো। বেড়ানোর সময় দলবল ভারী হলেই ভালো। একটা চোদ্দ সিটের গাড়ি ভাড়া করেছে ওরা, যাতে সবাই একসঙ্গে আড্ডা মেরে যাওয়া যায়। ড্রাইভারের সিটে এখন সুনন্দ, পাশে আদিত্য। মাঝের সিটে অর্ক আর তীর্থঙ্কর। বাকিরা বসেছে পেছনের সিটগুলোতে। অর্কর স্বপ্নটা শুনে সবার মধ্যেই বেশ নড়াচড়া পড়ে গেল। জানলা একটু খুলল অর্ক। ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটাকে জুড়িয়ে দিল। চোখেমুখে ঠাণ্ডা ঝাপটা লাগছে, কিছুক্ষণ সেটা উপভোগ করল। 'টাইনং' , চেঁচিয়ে উঠল গিনি। গাড়িটা দ্রুত রাস্তার ধারের সবুজ বোর্ডটাকে প্রায় ছুঁয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, লেখা আছে, টাইনং।

ইন্দ্রাণী : গতবছর আমাদের বাগানের রাস্তাটা বাঁধানোর জন্য হলুদ রঙের গুঁড়ো পাথর কিনেছিলাম এক লরি। সেই পাথরটার নাম ছিল টাইনং টপিং। বোধহয় এখানকার পাহাড় থেকেই খুঁড়ে বার করে।

সুনন্দ : অর্ক, তোর এই স্বপ্নটা তো একেবারে 'পৃথিবীর শেষের দিন' মার্কা সিনেমাগুলোর মতো!

প্রজ্ঞা : 'মোয়াব' শব্দটা চেনা-চেনা লাগছে। মোয়াব মানে কি মাদার অফ অল বম্বস?

সুনন্দ : সেটা আবার কী?

ইন্দ্রাণী : উরেব্বাবা, কী ফাটাফাটি নাম– সব বোমার মা হলো এই বোমা! কিন্তু সেটা কী জিনিস?

প্রজ্ঞা : দু'হাজার সতেরো সাল নাগাদ আমেরিকা আফগানিস্তানে একটা বোমা ফেলেছিল। পরমাণুবোমা বাদ দিলে সেটাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো বোমা বিস্ফোরণ। এগারো টন বিস্ফোরক ঠাসা আমেরিকান মিসাইল। যাকে ওরা নাম দিয়েছিল, মাদার অফ অল বম্বস।

প্রজ্ঞার সঙ্গে সুনন্দর আলাপ বেশিদিনের নয়। দু'জনের বয়সের ফারাক অনেক। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী প্রজ্ঞা। ফিজিক্স, অঙ্কশাস্ত্র আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বহু আবিষ্কারে ওঁর নাম জড়িয়ে আছে। এখন প্রায় অবসর, থাকেন তাসমানিয়ার ফোর মাইল ক্রিকে। বিয়ে করেননি, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্য বই লেখেন প্রজ্ঞা, তার কয়েকটা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার। পৃথিবী জুড়ে নানান টিভি চ্যানেলে, পডকাস্ট আর টক শোতে ডাক পড়ে ওঁর, সব বিষয়েই ওঁর মতামত বেশ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে আরও অনেক বিচিত্র বিষয় নিয়েও ওঁর পড়াশোনা। ইতিহাস, ভূগোল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ভদ্রমহিলা গল্প করতে খুব ভালোবাসেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে যায়, বোঝাই যায় না।

প্রজ্ঞা : ওয়াখান করিডোর, মোয়াব। স্বপ্নটা বেশ ইন্টেরেস্টিং।

দূরে দেখা যাচ্ছে একসারি নীল পাহাড়, তার পেছনে স্তরে স্তরে অনেক মেঘের জমায়েত। বোঝা যাচ্ছে না, কোনটা পাহাড় আর কোনটা মেঘ। সূর্যের তিনটে তীর্যক রশ্মি আকাশ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে, পাহাড়ের একটা ঢাল আলোয় আলোময় করে রেখেছে। হঠাৎ করেই সেই আলোটা নিভে গেল। সোনালি আকাশের মুখ ভার হয়ে গেল কালো মেঘে। শনশন শব্দে বাতাস ছুটে এল। একরাশ লাল বালি উড়ে এল, ঘুরপাক খেতে লাগল দিগন্ত জুড়ে। দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে গেল চারিদিক। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে বৃষ্টির চাদর ভেদ করে ওদের গাড়ি এগিয়ে চলল।

''আমেরিকা সেই বিরাট বোমাটা আফগানিস্তানে কেন

ফেলেছিল, জানেন কি?'' প্রশ্ন তীর্থঙ্করের।

''দাঁড়াও'', বলল প্রজ্ঞা, ''আগে একটু জল খাই।''

''এই নিন'', অর্ক তাড়াতাড়ি একটা জলের বোতল এগিয়ে দিল।

''অ্যাই অর্ক'', বলল সুনন্দ, ''তুই কি স্কুল লাইফেও ন্যাটা ছিলি?''

''অ্যাঁ?'' চমকে উঠল অর্ক।

''না, দেখছি আজকাল তুই সব কাজেই বাঁ-হাত দিয়ে করিস। খাচ্ছিস বাঁ-হাতে। এই যে জলের বোতলটা এগিয়ে দিলি, সেটাও বাঁ-হাতে। তুই ছোটোবেলায় ন্যাটা ছিলি, সেটা তো কই মনে পড়ছে না!''

''আমি চিরকালই বাঁ-হাতি'', নীরস স্বরে বলল অর্ক, ''তুই ভুলে গেছিস।''

''তাই? হবেও-বা!'' বলল সুনন্দ, ''আজকাল আমার বোধহয় মেমোরি ফেল করছে। এই যেমন, গেলবার দেশে গিয়ে সুদীপের সঙ্গে দেখা হলো। আমার বেশ মনে আছে সুদীপ কট্টর সিপিএম ছিল। পাড়ায় একটা লালপার্টির ক্লাব ছিল, পার্ট টাইমে ইঁট চুন সুরকি সাপ্লাই করত। লেখাপড়া ছেড়ে সুদীপ সেই ক্লাবেই পড়ে থাকত দিন-রাত। সেবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, রীতিমতো অস্বীকার করল। বলল, ও নাকি ছাত্রজীবন থেকেই দিদির ন্যাওটা। অবাক কাণ্ড। তা হবেও-বা। আমারই হয়তো ভুল। আচ্ছা, তোর তো খেলাধুলায় বেশ ঝোঁক ছিল। মনে আছে, বিকেলে কালবৈশাখীর বৃষ্টি নামলেই আমরা ধোপার মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলতাম। কাদা প্যাচ প্যাচ মাঠে। খেলা কম, আছাড় বেশি...তুই থাকতিস সবার আগে। তারপর.... তোর তো পাড়ার ক্যারাটে ক্লাবেও যাতায়াত ছিল। এর ওপর ন্যাড়া অশ্বত্থতলার ওখানে সঙ্ঘের শাখায় গিয়ে লাঠি ঘোরাতিস, লিকলিকে বেত আর চামড়ার ঢাল নিয়ে লাফালাফি করতিস, সেইসব শরীরচর্চা এখনো চালু রেখেছিস, না ছেড়ে দিয়েছিস?''

''শরীরচর্চা, এই বয়সে? তুই কি পাগল হয়েছিস! আমার কোমরের ব্যথা ..... তার ওপর সায়টিকা.... ধুস!''

বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে প্রজ্ঞা বললেন, ''হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। সেই সময়ে টিভি চ্যানেলগুলো বলছিল, হিন্দুকুশের মাটির তলায় নাকি মাইলের পর মাইল ব্যাপী সুড়ঙ্গের জাল বিছানো রয়েছে। এরকমই একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রথম সারির তালিবান কমান্ডার লুকিয়ে বসেছিল। তাদের মারার জন্যই ওই মোয়াব।''

''হিন্দুকুশের মাটির তলায় সুড়ঙ্গের জাল, মাইলের পর মাইল জুড়ে?'' অবাক হলো সুনন্দ। ''কারা বানিয়েছে সেটা? তালিবানরা?''

''হাসিও না'', বলল প্রজ্ঞা, ''তালিবানরা আজ পর্যন্ত কিছুই বানায়নি, শুধু নষ্টই করেছে।''

''তাহলে কে বানালো ওই সুড়ঙ্গের জাল?''

''সেটা একটা রহস্য...''

''বুন্যিপ'', হাঁকলো গিনি।

''তোর এই এক বদ অভ্যাস, গিনি!'' বলল আত্রেয়ী, ''যেখানেই সাইনবোর্ড দেখিস, চেঁচিয়ে পড়া শুরু করিস। আশেপাশের লোকেরা যে বিরক্ত হয়, সেটা খেয়াল করিস না?''

বৃষ্টি যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। জানলা খুলে মুখ বাড়ালো গিনি।

আত্রেয়ী : গিনি, ওরকম করে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াস না।

গিনি : কেন, কী হবে?

আত্রেয়ী : কিছু একটা উড়ে এসে লাগতে পারে। এত স্পীডে চলছে। তাছাড়া, বাতাসটা তোর কানে লাগছে না? কান কালা হয়ে যাবে যে!

আদিত্য : আরে, এই নামটা চেনা চেনা লাগছে।

গিনি : কোন নামটা?

আদিত্য : এই যে, এই জায়গাটার নাম বললি—বুন্যিপ! খুব চেনা লাগছে নামটা। কোথায় যেন...

আত্রেয়ী : চাঁদের পাহাড়।

আদিত্য : তাই?

আত্রেয়ী : হ্যাঁ। সেই জঙ্গলের দানব, বুন্যিপ।

আদিত্য : চাঁদের পাহাড় তো আফ্রিকায়! আফ্রিকান নাম এখানে? অবাক কাণ্ড!

গিনি : এখানকার ট্রাইবালদের মধ্যে বুন্যিপ বলে একরকম জলার দানোর গল্প চালু আছে। সেখান থেকেই বোধহয় নামটা হয়েছে। জানো বাবা, এই কাছেই একটা জায়গা আছে, নাম হন্টেড হিল্‌স। সত্যিই কি পাহাড়টা হন্টেড? ভূত আছে ওখানে?

আদিত্য : জানি না রে! তুই এতসব জানলি কী করে? ও, সরি প্রজ্ঞা, আপনার কথার ঘাড়ে কথা বলে ছন্দ নষ্ট করে দিলাম। আপনি বলুন।

প্রজ্ঞা : না না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হিন্দুকুশের নীচের সেই সুড়ঙ্গের জাল, সেটা পৃথিবীর অনেক অমীমাংসিত রহস্যের মধ্যে একটা। এরকম অনেক প্রাচীন সুড়ঙ্গের জালই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর নানান জায়গায়। প্রায় সবকটাই একরকম অমীমাংসিত রহস্য।

''মাউন্ট ব ব!'' হাঁকলো গিনি।

পথ এখানে আর সরলরেখা নয়, বারে বারে বাঁক ঘুরছে, চড়াই-উতরাই করছে। দু'পাশের গাছের সারিগুলো এখন আরও ঘন হয়ে এসেছে, যেন ওদের শীত করছে। কালচে সবুজ রং ওদের। ব ব পাহাড়ের এলাকা শুরু হয়েছে। একটা ঢালের মুখে হঠাৎ করেই সামনে দেখা গেল, আকাশ জুড়ে দুটো

রামধনু। যেন জলরঙের তুলি দিয়ে ওয়াশে আঁকা দুটো পথ, কোনো দেবতার আকাশ-বাড়ির দিকে গিয়েছে। বৃষ্টি ধোয়া পরিষ্কার আকাশটাকে কেউ যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছে। অবাক প্রজ্ঞা বাকরুদ্ধ হলো। চুপ বাকি সবাই। একটু পরে ইন্দ্রাণী বলল, এই গিনিটা বড্ডো বিরক্ত করছে। প্রজ্ঞা, আপনি থামবেন না। কী বলছিলেন, ওরকম সুড়ঙ্গের জাল পৃথিবীর আরও অনেক জায়গায় রয়েছে?"

প্রজ্ঞা : আছে তো, এরকমই একটা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম গত বছর। জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরে নয়।

"নিলমা!" হেঁকে উঠল গিনি।

আদিত্য : নিরমা?

গিনি : না, নিলমা, উইথ অ্যান এল।

আশেপাশের গাছগুলো উধাও হয়েছে, তার জায়গায় দেখা যাচ্ছে পশুচারণ ক্ষেত্র। যতদূর চোখ যায় শুধু মাঠ আর মাঠ, হালকা সবুজ রং। গোরু চরছে, ভেড়া চরছে। আত্রেয়ী বলল, "প্রজ্ঞা, আপনার সেই বেড়ানোর জায়গাটার কথা বলুন প্লিজ।"

প্রজ্ঞা : হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। যে জায়গাটায় গিয়েছিলাম, সেখানকার ভূগোলটা শুধু কল্পনা করো। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল, ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, মাঝখানে বিশাল এক সমুদ্র। অগুন্তি ছোটো ছোটো দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। কিছু প্রবাল দ্বীপ, কিছু আবার আগ্নেয় দ্বীপ। কত দ্বীপ আছে, তার হিসেব রাখাও মাঝে মাঝে মুশকিল হয়ে পড়ে। জানো তো, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলটা চিরকাল মানুষের কল্পনা আর অনুসন্ধিৎসাকে উজ্জীবিত করে এসেছে। অনেক রোমহর্ষক গাথা ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের দ্বীপগুলোকে নিয়ে। রবিঠাকুরের 'যাবই আমি যাবই'—তাসের দেশের সেই আজব দ্বীপ, সে তো বোধহয় এই সমুদ্রেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকম্পের পটভূমি, হেমেন রায়ের প্রশান্তের আগ্নেয় দ্বীপ সবই এই জায়গাটার ওপর লেখা। থই থই সেই সাগরের মাঝখানে আছে মাইক্রোনেশিয়া অগুন্তি ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে তৈরি একটা দেশ। এই দেশেরই একটা ধারে আছে নান-মাদোল, দু'শো একর ব্যাপী এক শহর। নব্বইটা দ্বীপ নিয়ে তৈরি শহরটা, জলের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে প্রতিটা দ্বীপ থেকে পাশের দ্বীপে। এগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক দ্বীপ নয়, প্রতিটা দ্বীপই মানুষের তৈরি। অসংখ্য ব্যাসাল্ট পাথরের আয়তক্ষেত্রাকার লগ দিয়ে তৈরি হয়েছে দ্বীপগুলো, প্রতিটা ব্যাসাল্ট লগই এরকম দেখতে, একই সাইজের। প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান, প্রায় পঁচিশ কোটি টন ব্যাসাল্ট পাথর লেগেছিল শহরটা তৈরি করতে। একেকটা লগ আঠারো থেকে পঁচিশ ফুট লম্বা, সতেরো ফুট চওড়া, ওজনে প্রায় পঞ্চাশ টন।

বিবু : উরেবাবা! এটা কি দৈত্যদের শহর? আমরা যেরকম ছোটো ছোটো পোড়ামাটির ইট গেঁথে বাড়ি বানাই, ওরা সেরকম পঞ্চাশ টন ওজনের একেকটা পাথরের ইট—একটার ওপর একটা গেঁথে শহর বানিয়েছে।

প্রজ্ঞা : ঠিক তাই। তার ওপর ভেবে দ্যাখো, ব্যাসাল্ট পাথর কিন্তু এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কোথা থেকে আনা হয়েছিল এই ভারী পাথরগুলো? কে এত সুন্দর করে কেটেছিল অতিকায় পাথরের এই অতিকায় ইটগুলো? কেই-বা এত ভারী ভারী পাথরের লগ বয়ে এনে সমুদ্রের মাঝখানে এরকম একটা শহর তৈরি করল? কেই-বা জলের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে এই শহরের দ্বীপগুলোকে সংযুক্ত করল? কেনই-বা করল? কেউ জানে না। ঠিক তেমনিভাবে আমরা জানি না হিন্দুকুশের নীচের ওই সুড়ঙ্গগুলো কে বানিয়েছিল।

দু'পাশের পাহাড়ি প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে গাড়ি উঠছে, নামছে, বারে বারে বাঁক ঘুরছে রাস্তাটা। সামনে ট্রারালগন, এই অঞ্চলের বড়ো মফস্‌সল শহর। হঠাৎ করেই সুনন্দ গাড়ির স্পিড কমালো। সামনের গাড়িগুলো খুব ধীরে ধীরে চলছে। দূরে রাস্তার ধারে একটা লাল-নীল আলো জ্বলছে। তীর্থঙ্করের মা মদালসা উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, "কী হলো?"

তীর্থঙ্কর বলল, "মনে হচ্ছে... সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।"

গাড়ি আরেকটু এগোলে দেখা গেল, সত্যিই তাই। বড়োসড়ো একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। যাওয়ার রাস্তার আর ফেরার রাস্তার মাঝখানে আছে চওড়া বুলেভার্ড আর একসারি বড়ো বড়ো গাছ। ফেরার রাস্তা থেকে একটা গাড়ি সেই গাছের সারি ভেঙে উলটোদিকের রাস্তায় এসে পড়েছে। পাশেই একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে, প্যারামেডিকরা গাড়ি থেকে লোকেদের ধরাধরি করে বার করছে। গাড়ির ড্রাইভার রক্তে মাখামাখি। ওই গাড়িটা থেকে কিছুটা দূরে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। উঁকি মেরে দেখেই চিৎকার করে উঠল আত্রেয়ী। গাড়ির ভেতরের সবকটা লোক পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। পাশেই একটা অসহায় দমকলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাঁচাবার মতো কিছু আর বাকি নেই। তিনটে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লাল-নীল আলো জ্বলছে ওগুলোর মাথায়।

"ও-ও-ও-ও-ওয়াক!" মুখে রুমাল চাপা দিল ইন্দ্রাণী।

"সুনন্দ, তাড়াতাড়ি চল", অর্ক বলল।

লেন চেঞ্জ করে সুনন্দ এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চলার পরে শহরের ঠিক মাঝখানে বাঁদিকে পড়ল বিরাট একটা পার্ক। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো মাটিতে, পাশ দিয়ে সরু একটা জলধারা বয়ে চলেছে কুলুকুলু শব্দে। রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করালো সুনন্দ।

"এখানে একটু নামি চল। আমার মাথাটা ঘুরছে।" বললো সুনন্দ।

সবাই হইহই করে নামলো পার্কে। জলের ধারেই একটা বেঞ্চি আছে, ইন্দ্রাণী গিয়ে বসল সেখানে। রেশমী ব্যাগ থেকে একটা বালতির ঢাকনার মতো দেখতে ফ্রিসবি বের করল।

''গিনি, ক্যাচ!'' রেশমী ফ্রিসবিটা ছুঁড়ে দিল গিনির দিকে। পার্কের এপার থেকে ওপার ফ্রিসবি উড়ে গেল ভিনগ্রহের উড়ন্ত চাকতির মতো। একটা লাফ দিয়ে গিনি ধরে ফেলল চাকতিটা। ধরেই ছুঁড়ে দিল রেশমীর দিকে। রেশমী দৌড়োলো ধরতে। দুজনের মধ্যে খেলা জমে উঠল। বড়োরা উৎসাহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের খেলা। সব বড়োর মধ্যেই একটা বাচ্চা থাকে বোধহয়।

''এই রেশমী, আমাকে খেলায় নিবি?'' বলল আদিত্য।

''শিওর! কাম অন ইন্!''

আদিত্যর পিছুপিছু আরও কয়েকজন বড়ো এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে খেলায়।

হঠাৎ আত্রেয়ী বলল, ''আরে, সেই মাছভাজার বালতিটার কথা তো ভুলেই গেছি। ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওগুলো।''

বিবু বলল, ''না না, আমি বালতিটা হটবক্সে ভরে রেখেছিলাম। ঠাণ্ডা হবে না। দাঁড়াও, বার করছি।''

হটবক্স থেকে কাগজের বালতি ভর্তি ধোঁয়া ওঠা মাছভাজা বেরোলো। ঢাউস পিসগুলো, লালচে-সোনালি রঙের কিরিকিরি আস্তরণ গায়ে। চটপটা, ঝাল। খিদে সবারই পেয়েছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই বালতিটার ওপর। ইন্দ্রাণী শুধু খেল না।

সুনন্দ বলল, ''চলো, রওনা হওয়া যাক। তীর্থঙ্কর, তুমি কি এবার গাড়ি চালাবে?''

''নিশ্চয়ই।''

সুনন্দ পেছনের সিটে বসল, ড্রাইভারের সিটে তীর্থঙ্কর। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ট্রারালগনের সীমান্তে যে ট্রেনলাইনটা আছে, সেটা পার হলো ওদের গাড়ি। সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি। মাঝে মাঝেই চোখের সামনে এসে পড়ছে, কিছুক্ষণের জন্য চোখ ঝলসে দিচ্ছে। 'মোয়ী', হাঁক পাড়লো গিনি। রাস্তার দু'ধারে এখন শুধু বিশাল প্রান্তর, অনেক গোরু চরছে, দূর থেকে ওদের কালো কালো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। সূর্য দিগন্তে ঢলেছে। গোরুগুলো সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে, কোথায় কে জানে। বোধহয় বাড়ি ফিরছে। গোরুর খুরের আঘাতে লাল ধুলো উড়ছে আকাশে। আকাশ লাল। লাল আলো আর লাল ধুলো মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'গোধূলি', অস্ফুটস্বরে বলল আত্রেয়ী।

সন্ধ্যের আগেই পড়ল রোজ্‌ডেল। গতি ১০০ থেকে নেমে হলো ৬০, ঢিমে তেতালায় চলছে গাড়ি। ''দ্যাখো দ্যাখো কী সুন্দর'', চেঁচিয়ে উঠল ইন্দ্রাণী। রাস্তার পাশেই একটা সুন্দর কটেজ, সামনে বড়ো একটা বাগান। বাগানে শুধু গোলাপ গাছ। গোলাপের যেন হাট বসেছে। ফুলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে, পাতা দেখা যায় না। একেকটা গোলাপ হাতের তেলোর সাইজের। কত না রং। গোধূলির শেষ আলো ছুঁয়ে গেল ফুলগুলোকে, যেন প্রণয়ীর শুভরাত্রির চুম্বন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওদেরকে।

''তেমির মুষ্ট.. তেমির মুষ্ট..।'' ''বিড়বিড় করে বলছিল প্রজ্ঞা। রোজ্‌ডেল পেরোতেই নামলো অন্ধকার। এখনো অনেকটা রাস্তা বাকি। সেইল থেকে রাস্তা বাঁদিকে ঘুরলো। ব্যানসডেল। তারপর লম্বা রাস্তা লেকস এন্ট্রান্সের দিকে। বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে গাড়ি, মাথা ঘুরছে। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাস্তা। হেডলাইটের আলোটুকুই সম্বল। মাঝে মাঝে ওদিকে থেকে আরেকটা গাড়ি এসে পড়ছে, জোরালো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির গতি কমিয়েছে তীর্থঙ্কর, ফুল স্পিডে চালাতে ভয় করছে। প্রায় একঘণ্টা পর রাস্তার ধারে দেখা গেল একটা সাইনবোর্ড—'ওয়েলকাম টু লেকস এন্ট্রান্স'। সমুদ্র এখান থেকে আরও এক কিলোমিটার। কিছুদূর চলার পড়েই সামনে পড়ল একটা ব্রিজ। বিরাট একটা লেকের ওপর দিয়ে ব্রিজটা গেছে। পাড়ের আলোয় ঝিলমিল করছে লেকের জল। ছোটো ছোটো প্রমোদতরণী ঘুরছে জলে। ব্রিজ পার হয়ে কিছুদূর চলার পর দূরে দেখা গেল আলো ঝলমল একটা চৌকোনো কাচের তৈরি নৌকো ভাসছে জলে। কাচের ঘেরাটোপ, আলো ঝলমল করছে। নিয়ন সাইন জ্বলছে 'ফ্লোটিং ড্রাগন রেস্টুরেন্ট'।

''এসে গেছি।'' বলল সুনন্দ। বাঁদিকে ঘুরিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করল তীর্থঙ্কর।

''শোয়ার ব্যবস্থা কী হবে রে?'' তীর্থঙ্কর বলল।

''এই তো, আমরা ছেলেরা নীচের তলার বেডরুম আর সোফায় ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়ছি। মেয়েরা ওপরতলাটা নিক।'' সুনন্দ বলল।

''আমি কিন্তু বাইরে শোবো'', প্রজ্ঞা বললেন।

''বাইরে মানে?''

''মানে, বাগানে ওই যে আরামকেদারাটা আছে, ওটাতে।''

''ঠাণ্ডা লাগবে না?''

''ঠাণ্ডা কোথায়? গরমকাল তো।''

''শেষ রাতে তো হিম পড়বে। এটা ভিক্টোরিয়া রাজ্য, ঠাণ্ডার খাসমুলুক, ভুলে যেও না।''

''আমি তাসমানিয়ার বাসিন্দা, এটাও ভুলে যেও না।

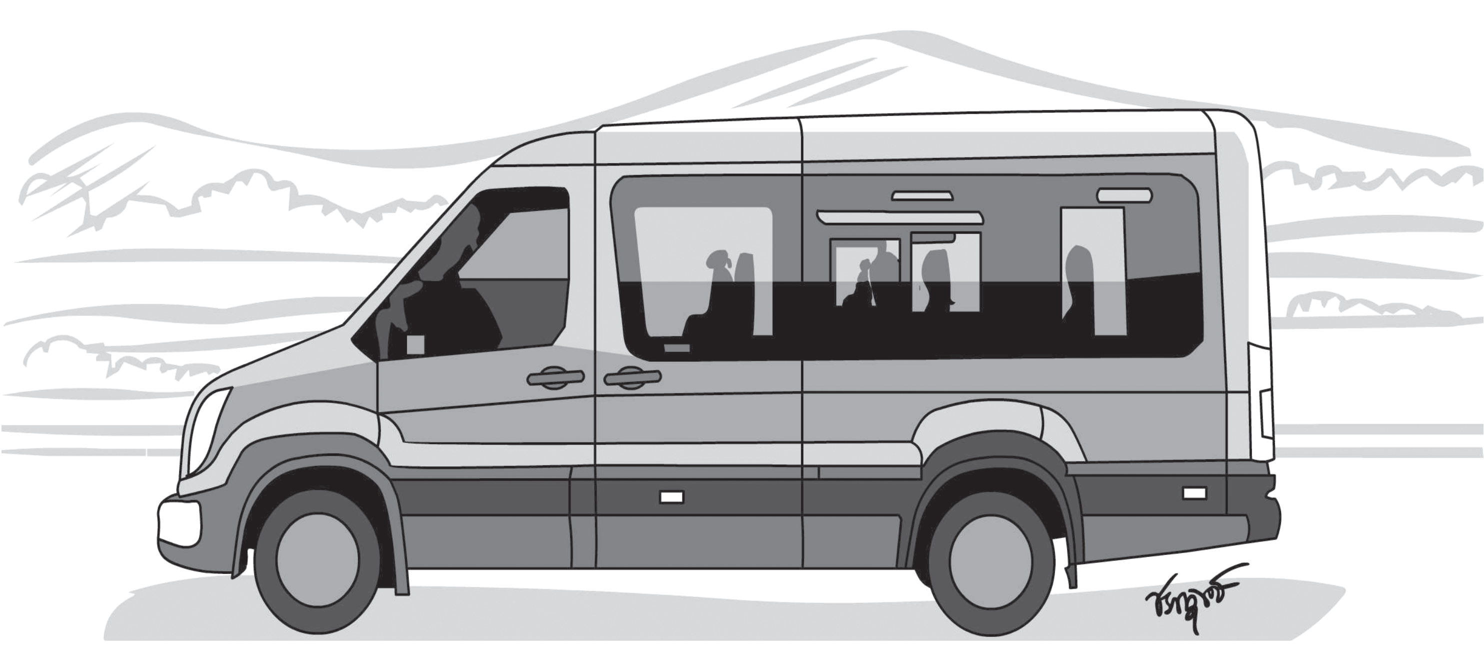

তাসমানিয়ার ঠাণ্ডার কাছে তোমাদের ভিক্টোরিয়ার ঠাণ্ডা হলো শিশু।"

"মানছি, তবু..."

"আরে, নো ওয়ারিজ মাইট।"

নীচে একটা শোয়ার ঘর, আর মস্ত একটা বসার ঘর। সেই ঘরের শেষে ওপেন প্ল্যান রান্নাঘর, কাচের মস্ত স্লাইডিং দরজার ওপারে ছিমছাম ছোট্টো একটা বাগান। বাগানে সাজানো ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, ইজিচেয়ার। বারবিকিউয়েরও ব্যবস্থা আছে। বসার ঘর থেকে সিঁড়ি উঠেছে দোতলায়, ওপরে তিনটে শোয়ার ঘর, আর একটা বড়ো বারান্দা। বাথরুমে সাবান থেকে শুরু করে রান্নাঘরে বাসনপত্র পর্যন্ত সব ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। কিন্তু এত লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার পর রান্না করার মতো মানসিক অবস্থা কারোরই নেই। তাই রাতের খাওয়ার জন্য পিজ্জার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, সেই ডেলিভারি এল বলে। এই ফাঁকে বসার ঘরে জমিয়ে আড্ডা বসেছে। এতক্ষণ জানা ছিল না, এইমাত্র জানা গেছে, তীর্থঙ্করের মা মদালসা সেন আসলে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মদালসা দেবী। এই বয়সেও অসামান্য সুন্দরী উনি, তার ওপর আধডজন বিখ্যাত পুরস্কার ওনার ঝুলিতে আছে। খবরটা কীকরে প্রকাশ পেল বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তাতে মদালসাকে অখুশি মনে হচ্ছে না। জমিয়ে বসে উনি বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশার কথা বলছিলেন।

মদালসা : এখন একটা বিশাল বন্ধ্যা সময় চলছে, বুঝলে?

ইন্দ্রাণী : আচ্ছা মাসিমা, লোকে বলে আপনি যত লিখেছেন, সেই সব বই ওজন করলে নাকি একটা ট্রাকের থেকে বেশি ভারী হবে। সত্যি? এরকম কোনো পরীক্ষা কেউ কি করেছে কখনও?

মদালসা : সে কথা আমি জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি রবীন্দ্রনাথের থেকেও বেশি লিখেছি। আর কেনই-বা লিখব না। লোকে আমাকে চায়, তাই লিখি। এই তো দেখো না, বিভূতিবাবুর পরে এক আমি ছাড়া আর কোনো বড়ো সাহিত্যিক কই? আর কাউকেই তো মানুষ সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করল না।

ইন্দ্রাণী : সেকী! কেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়? তারপর আমাদের সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, শঙ্কর, প্রেমেন মিত্তির, বুদ্ধদেব গুহ....

আদিত্য : বিভূতিবাবুটা কে মাসিমা?

মদালসা : বিভূতিবাবু কে, সেটা জানো না? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়! নাম শোননি?

আদিত্য : ও, তাই বলুন। জানবো না কেন? চাঁদের পাহাড় ছোটোবেলায় কতবার পড়েছি। তারপর পথের পাঁচালী। আরণ্যক তো এখানো আমার ব্যাগে আছে। আর দেবযান, সেটা তো অন্য লেভেলের। আপনি হঠাৎ করে 'বিভূতিবাবু' বললেন তো, তাই একটু চমকে গেছিলাম। তা, ওনার সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল বোধহয়? বিভূতিবাবু বলেছেন যখন......

মদালসা : আলাপ কী করে থাকবে? উনি আমার থেকে বয়সে কত বড়ো। তবে ওনার সেই স্মৃতিক্ষেত্র ঘাটশিলা, ওখানে আমি একটা বাড়ি কিনেছি।

ইন্দ্রাণী : ও তাহলে তো আপনি বিভূতিবাবুর কাছেই আছেন।

আত্রেয়ী : সত্যি, মাসিমা আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে কখনো ভাবিনি। এই তীর্থঙ্করটা কখনো বলেনি যে আপনি ওর মা।

মদালসা : কেন বাবু, কেন তুমি তোমার বন্ধুদের বলোনি। তোমার মা কতবড়ো একজন সাহিত্যিক। এতে সংকোচের কী আছে? তা আত্রেয়ী, তুমি আমার হালের উপন্যাসটা নিশ্চয়ই পড়েছো।"

আত্রেয়ী : কোনটা মাসিমা?

মদলসা : কেন, বন্য শরীরের হাহাকার? যেটার জন্য এবার আমি বঙ্গভূতি পুরস্কার......

আত্রেয়ী : ভালো লোককেই বলেছেন মাসিমা। আপনার গল্প আমি খুব পড়েছি, কিন্তু সে সবই ছোটোবেলায়। সেই যে টাইগার চাচা সিরিজ, সেই গল্পগুলো। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা লোক গল্পের বই ফিরি করে যেত। গোপাল ভাঁড়, বীরবল, মনসামঙ্গল, পাঁচালি, আর বাকি সব আপনার গোয়েন্দা টাইগার চাচা সিরিজ। কী পপুলার যে ছিল বইগুলো। ছুটির দিনে দুপুরবেলা বাবার পকেট মেরে পয়সা জোগাড় করে বারান্দায় বসে থাকতাম, কখন ফেরিওয়ালাটা আসবে, টাইগার চাচার নতুন অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে। কী সব রোমহর্ষক গল্প! একটা দৃশ্য তো এখনো মনে আছে। ডাকাত কালো মাকড়সার ডেরায় পৌঁছেছে টাইগার চাচা, সেই ডেরা হলো মহাকাশে। আজব সে মহাকাশ। সেখানে রংবেরঙের জলভরা মেঘ ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানের কোনো নিয়মই মানে না সেই মহাকাশ। কী কিম্ভুত কাণ্ড বলুন তো! টাইগার চাচা সেই মহাকাশে গিয়ে খুব যুদ্ধ করল। সেখানে চাচাকে বিশেষ ধরনের এক বন্দুক ব্যবহার করতে হলো, কারণ মহাকাশে সাধারণ বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে নাকি বেশিদূর এগোয় না, একটু গিয়েই গোঁত্তা খেয়ে পড়ে যায়। আচ্ছা মাসিমা, ব্যাপারটা তো উলটো হবার কথা। মহাকাশ তো শূন্য, বাতাসের বাধা নেই, বন্দুকের গুলি অনন্তকাল চলতে থাকবে। আপনি লিখলেন উলটো। আপনি কী ভেবেছিলেন মহাকাশের ঘনত্ব জলের থেকেও বেশি? দৃশ্যটা আমি অনেকবার ভিজুয়ালাইজ করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। অবশ্য টাইগার চাচার পক্ষে সবই সম্ভব, তাই না? উনি ডিটেকশন বা অনুসন্ধানের ধার ধারেন না। যেখানে দরকার, সেখানে শুধু বডিটা ফেলে দেন। সন্দেহের বশে ভিলেন ওনাকে কিডন্যাপ করে ডেরায় নিয়ে যায়। সেই ডেরায় মারপিট করে সবাইকে হারিয়ে বেরিয়ে আসেন চাচা। তা সে ডেরা মহাশূন্যে হোক বা আগ্নেয়গিরির গর্ভে, একই টেকনিক। আপনার প্রত্যেকটা গল্পের একই ছক। আমার খুব দুঃখ হতো ভিলেনগুলোর জন্য। আহা, চাচা ছুটি কাটাতে এসেছেন, ওনাকে শান্তিতে থাকতে দে। ওনাকে না ঘাঁটালেই তো আর এত কাণ্ড হয় না, ধরাও পড়তে হয় না। তাই না?

মদালসাকে স্পষ্টতই বিব্রত দেখায়। টাইগার চাচা সিরিজ নিয়ে কথা বলা উনি পছন্দ করেন না।

মদালসা : ওসব অনেক পুরোনো দিনের কথা। তোমরা কেউ আমার সাম্প্রতিক কোনো বই পড়োনি? আমার বন্য শরীরের হাহাকার পড়োনি? এই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নির্যাতিত নিপীড়িত নারীর প্রতিবাদ ওটাতে আমি কীভাবে তুলে ধরেছি, পড়লে সেটা তোমরা বুঝতে।

সেকুলারিজমের প্রভাব ভারত থেকে যেভাবে উবে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে... ওঃ আমি অবাক হচ্ছি, তোমরা কেউ বইটা পড়নি?"

প্রজ্ঞা : আমি পড়েছি।

মদালসা : ও আপনি পড়েছেন? কেমন লেগেছে?

সারা রাস্তাটাই মদালসা প্রজ্ঞার ওপর বিরক্ত ছিলেন। একে তো এই একজন মহিলা যে ওঁর থেকেও বেশি খ্যাতিপ্রাপ্তা, জ্ঞানী। শুধু নামেই প্রজ্ঞা নয়, বুড়িটা যেন সবকিছুই জানে। সব লাইমলাইট- টুকু একাই টেনে নিচ্ছে। সে বিরূপতা বুঝি এবার এক ঝটকায় কেটে গেল।

প্রজ্ঞা : কী বলবো জানি না। আমার বাংলা সাহিত্য শরদিন্দু আর বিভূতিভূষণেই আটকে আছে, আমার ভালোলাগার বিবর্তন ওর আগে বেশি এগোয়নি। তবে আপনার গল্পটা বেশ একটু ... মানে ... ইয়ে আর কী। আটাত্তর পৃষ্ঠার গল্পে আপনি তিরাশিবার 'ধর্ষণ' কথাটা ব্যবহার করেছেন, তেষট্টিবার 'যৌবন' কথাটা ব্যবহার করেছেন, একানব্বইখানা গালাগাল ব্যবহার করেছেন, কুড়িখানা শারীরিক সম্পর্কের সিন আছে। আপনার গল্পের সবকটা বিবাহিত চরিত্রেরই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক আছে, তা সে পুরুষ হোক বা নারী...

মদালসা : সোজা ভাষায় বলুন, আপনার ভালো লাগেনি। আমি সবার জন্য গল্প লিখি না। বিশেষ করে আপনাদের মতো গোঁড়া পিউরিটান লোকেদের জন্য।

প্রজ্ঞা : আমি পিউরিটান নই, যথেষ্ট মুক্ত মনের। কিন্তু কোনটা সমাজের পক্ষে ভালো, সেটাও তো দেখা....

মদালসা : আমার গল্প যারা বোঝে, তারা আমাকে পুরস্কার দেয়। আমি কী কী পুরস্কার পেয়েছি শুনবেন? জানেন, একবার এক বিখ্যাত ফিল্ম অভিনেত্রী আমার বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে একসঙ্গে সাতজন পুরুষের..."

ইন্দ্রাণী : সেটা কি ভালো?

মদালসা : তোমরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকো, কিন্তু চিন্তাভাবনাগুলো ভারতের মতো। তোমাদের এই দেশে...

ইন্দ্রাণী : না মাসিমা, এটা একটা ভুল ধারণা। ব্যাভিচার পশ্চিমের দেশগুলোতেও স্বীকৃত নয়। ব্যাভিচারীদের কেউ পছন্দ করে না।

মদালসা : ভালো মন্দ ব্যাপারটা আপেক্ষিক। প্রশ্নটা সেটা নয়। আমি চারপাশে যা দেখি, সেটাই লিখি। আমার লেখা হলো সমাজের আয়না।

প্রজ্ঞা : সমাজের আয়না? দেশটা ভেঙে দু'টুকরো হলো, তারপর ভারতের খণ্ডিত দু'টো টুকরো প্রায় হিন্দুশূন্য হলো। এগুলোও তো আপনার চারপাশেই ঘটছে। খণ্ডিত ওই টুকরো দুটো থেকে কেন হিন্দুরা পালিয়ে আসছে, ওই দুটো দেশে হিন্দুদের কী দশা, সেটা কেন আপনাদের মতো সাহিত্যিকদের আয়নায় ধরা পড়ে না, বলতে পারেন?

মদালসা : ওসব নিয়ে লিখে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলেকে ইন্ধন দিতে আমি রাজি নই। তাছাড়া, আমার সাবজেক্ট হলো এই দেশটা, এই সমাজটা।

প্রজ্ঞা : তাও ভালো, তাহলে এই দেশটার কথাই হোক। গতকাল যারা জেদ করে জেহাদের নামে দেশটা ভাগ করল, আজ তারাই দলে দলে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে। সেটা দেখতে পাচ্ছেন না? পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপি থেকে সন্দেশখালি, কিছুই কি আপনাদের আয়নায় ধরা পড়ে না? আপনাদের আয়নাগুলো কি বাঁকা, না ভাঙা?

মদালসা : বললাম তো, সাম্প্রদায়িক শক্তি ইন্ধন পায়, এমন কিছু আমি লিখব না, তা সে যতই সত্যি হোক। তাছাড়া ওসব প্রান্তিক সমাজের ওপর আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার সাবজেক্ট আমার সমাজ, ভারতের শিক্ষিত শহুরে সমাজ।

প্রজ্ঞা : আর সেই সমাজটার মধ্যে আপনি বন্য শরীরের হাহাকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না? সাধারণ মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা, আদর্শের জন্য তাদের জীবন সমর্পণ, এসব কিছু দেখতে পান না?

মদালসা : বললাম তো, আমি যা দেখি, তাই লিখি।

প্রাজ্ঞা : তাহলে একটা কাজ করুন, দেখার পরিধিটাকে বাড়ান। একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে ভারতবর্ষ দেশটাকে দেখতে বেরিয়ে পড়ুন। সত্যিকারের দেশটাকে চিনুন। দেখতে পাবেন, দেশটার সাধারণ মানুষ আজও কত ভালো, কত সাচ্চা। আজও কত ভাই তার বোনের জন্য প্রাণ দেয়, কত ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে কাঁধে চাপিয়ে তীর্থদর্শন করাতে নিয়ে যায়। সমাজের সেই ভালো জিনিসগুলো....

মদালসা : ওসব লিখে আমার ছাই লাভ হবে। ওসব লিখলে কি আমাকে কেউ পুরস্কার দেবে? আমার উপন্যাসের কী শক্তিশালী প্রভাব সমাজের ওপর রয়েছে, সেটা ভেবে দেখুন। সেটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই তো সমাজের শক্তিমান লোকেরা আমাকে ভয় করবে, তোয়াজ করবে, ডেকে পুরস্কার দেবে। এই গলা পচা পতিতা সমাজ...

তীর্থঙ্কর : মা, তুমি এবার থামবে? বাচ্চাগুলো রয়েছে আশেপাশে। এই, আমরা বসে বসে কি এই সবই করবো? তোমরা অন্ত্যাক্ষরী কখন শুরু করবে?

মদালসা : অন্ত্যাক্ষরী কেন? তার বদলে চলো, একটা লিটারারি ওয়ার্কশপ করি। খুব ইন্টারেস্টিং হবে।

ইন্দ্রাণী : লিটারারি ওয়ার্কশপ? সেটা কীরকম?

মদালসা : এটা একটা মজার খেলা। আমি একটা গল্পের সুত্র বলবো, সেটাকে ধরে তোমাদের গল্পটাকে ডেভালাপ করতে হবে।

প্রজ্ঞা : বুঝেছি। প্যারানয়িক ক্রিটিক্যাল মেথড।

'মানে?' চমকে গেলেন মদালসা।

'ও না কিছু না, আপনি বলুন।' প্রজ্ঞা বলল।

মদালসা বলতে শুরু করলেন।

পয়লা বৈশাখের সকাল। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত সানির বাড়িতে পার্টির পর আজ সকালে পল্লবী একটু দেরি করেই উঠেছে। বেড-টি সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় আরামকেদারায় গিয়ে বসেছিল, সঙ্গে খবরের কাগজ। বারান্দা সামনে গলফ গ্রিন সেন্ট্রাল পার্ক, অনেক পাখি ডাকছে গাছে গাছে। খবরের কাগজের সাতের পাতায় ব্যক্তিগত কলমের একটা বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল। বিজ্ঞাপনে একটা কবিতা। লেখা আছে,

তুমি কি আসবে? নাকি আসবে না?

প্রতিবছর দিনশেষে পাই শুধু হতাশা, এবারও কি তাই হবে?

এবারও থাকব বসে তোমারি পথ চেয়ে, গলফ গ্রিনের সেই রেস্তোঁরায়।

আত্রেয়ী : না মাসিমা, এই কবিতাটা জমল না। ঠিক আঁতেল- আঁতেল হলো না?

মদালসা : জমল না, তার মানে?

আত্রেয়ী : দাঁড়ান, মাসিমা, এই কবিতাটাকেই আমি একটু গড়েপিটে নিই। তারপর বলুন কেমন লাগে। একটুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকে, তারপর আত্রেয়ী বলল, থেমে থেমে,

রিও ডে লা প্ল্যাটো দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে,
ভলগার তীরের কাকেরা সব হেজে মজে গেছে।
বছরের বাঁক ঘুরে, টিংটিং ট্রামে সওয়ার হয়ে,
বাংলা বছরের প্রথম দিন, আবার ফিরে এল।
এল সে আবার, অনেক যন্ত্রণা প্রত্যাশা নিয়ে,
তুমি কি আসবে? আবার ভালোবাসবে?
নাকি আবারও দেবে ফাঁকি? ইয়ার্কি নাকি।
সেই বছরটা মনে আছে, উরুগুয়ে জিতল?
মুণ্ডু কাটা মুরগি মাচায় বসে নাচল।
বাই বাই বলে আমায় চলে গেলে সিয়াটল,
বলেছিলে তুমি আসবে আবার, ফুটবে যখন পটল।
লাল নীল হলুদ সবুজ কতই তো ফুটল ফুল,
পটল ফুটল না কেন? নাকি আমারি মনের ভুল?
পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটাহাঁটি, অ্যাসিমভ নিয়ে কত চটাচটি।
সার্ত্রের 'ল্য নোসে', ট্রাবল দিল তোমার পিসে।
মেলাতে সেই বৃষ্টিতে ভেজা, দালির প্রদর্শনী ভ্যাবাচ্যাকা।
গ্র্যাফিটির গলিতে হামি-সেসব কি ভুলে গেলে তুমি?
প্রতিবছর দিনশেষে হাতে থাকে শুধু রেস্তোঁরার বিল,
গদ্যে জীবনের পদ্য লিখি, খুঁজে পাইনাকো মিল।
এবারও থাকব বসে তীর্থের কাক হয়ে,
গলফ গ্রিনের রেস্তোঁরায়, শূন্য কফিকাপের শৈত্য সয়ে।"

"সাধু! সাধু!" চেঁচিয়ে উঠল সবাই। শুধু মদালসাকে খুব

একটা খুশি দেখাল না।

আত্রেয়ী : কী মাসিমা, কবিতাটা কি আপনার ভালো লাগল না?

মদালসা : কবিতা কোথায়? ওটা তো ছড়া!

আত্রেয়ী : কেন? ছড়া কেন?

মদালসা : অন্ত্যমিল থাকলে সেটাকে ছড়া বলে। কবিতায় অন্ত্যমিল থাকে না।

আত্রেয়ী : তাই? তবে কি রবিঠাকুর সারা জীবন ছড়া লিখেছিলেন?

আদিত্য : দূর বাবা! ছড়া, কবিতা, হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? মাসিমা, আপনি গল্পটা চালান।

মদালসা : কে এই কবি? কার উদ্দেশে লিখেছে? কবিতাটা কোথাও যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। মনে পড়েছে। এখানে কাছেই একটা চাইনিজ কফি শপ আছে...

ইন্দ্রাণী : বুঝলাম না মাসিমা। চাইনিজ কফি শপ? সোনার পাথরবাটির মতো শুনতে লাগল। চাইনিজ টি শুনেছি, কিন্তু চাইনিজ কফি...

মদালসা : আহ্, চাইনিজ কফি শপ মানে, চাইনিজ খাবার বিক্রি হয়, আবার কফিও বিক্রি হয়। শুধু কফিতে কি পেট ভরে, না রেস্টুরেন্ট মালিকের ব্যবসা চলে?

ইন্দ্রাণী : আচ্ছা বুঝলাম। আপনার ওই টাইগার চাচার সঙ্গে বন্য শরীরের হাহাকারের মতো। এবার বলুন।

মদালসা : প্রতিবছর পয়লা বৈশাখের সারাদিন ওখানে শখের গায়কদের সমাগম হয়। কেউ লোকগীতি গায়...

ইন্দ্রাণী : বাংলা লোকগীতি, না চাইনিজ লোকগীতি?

মদালসা : কী যা তা বলছ? অবভিয়াসলি বাংলা লোকগীতি। চাইনিজ লোকগীতি এখানে কোত্থেকে এল?

ইন্দ্রাণী : না মানে, চাইনিজ কফিশপ যখন। আচ্ছা, চাইনিজ টি হয়, চাইনিজ কফি হয় না? তার সঙ্গে, সে যা হোক, আপনি বলুন...

মদালসা : যা বলছিলাম, কেউ লোকগীতি গায়, কেউ বাউল, কেউ বা আবার বাংলা ব্যান্ড। সারাদিন অনেক লোক আসে, গান শুনতে। কাল সানি ওই দোকানটার সামনেই ওকে ড্রপ করেছিল। তখনই নজরে পড়েছিল, সেই বিজ্ঞাপনটা। দোকানটার একটা নোটিশ বোর্ড আছে। অল্প খরচে ওখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। দোকানে, রাস্তার মোড়ে, বেশ চোখে পড়া জায়গায় নোটিশ বোর্ডটা আছে। তাই অনেকেই ওখানে বিজ্ঞাপন দেয়। সেখানে এই কবিতাটা লটকানো ছিল। এরকম কবিতা বিজ্ঞাপন কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? কার প্রতীক্ষা? আকাশ-পাতাল ভাবছিল পল্লবী, এমন সময় ওর মা পেছন থেকে এসে পড়ল।

''কী, মুখ না ধুয়েই কাগজ নিয়ে বসে পড়লি?''

''মা দ্যাখো তো, এই বিজ্ঞাপনটা কী অদ্ভুত, তাই না?''

কাগজটা দেখে ওর মা বলল, ''এটা? এটা তো আমি পঁচিশ বছর আগেও দেখেছি। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে বেরোয়।''

''তাই নাকি? অদ্ভুত, সত্যি!'' নিজের মনেই বলল পল্লবী।

মদালসা বললেন, ''এবার তোমরা বলো, এই লোকটা, যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সে একজন পুরুষ না নারী?''

এই প্রশ্নটা কেউই আশা করেনি। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। শেষে প্রজ্ঞা বলল, ''ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে। লিটারারি ওয়ার্কশপ যখন, তখন কিছুই হতে বাধা নেই। তাছাড়া, গল্পে এখনো এরকম কোনো সূত্র দেওয়া হয়নি, যাতে এটা বোঝায় যায়, বিজ্ঞাপনদাতা ছেলে না মেয়ে।''

অর্ক : এরকম অন্তহীন প্রতীক্ষা বোধহয় মেয়েরাই করতে পারে। মানে, পঁচিশ বছর ধরে...

আদিত্য : কলকাতায় ক'টা খবরের কাগজ আছে, ইংরিজি বাংলা মিলিয়ে? বিজ্ঞাপনদাতা কি সবকটা কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে? তা না হলে, যার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার কি করে নজরে পড়বে?

ইন্দ্রাণী : বিজ্ঞাপনটা কোনো প্রেমঘটিত, সেটাই ভাবছ কেন? এটাতো কোনো গায়কের উদ্দেশে কোনো ফ্যানও দিয়ে থাকতে পারে।

সুনন্দ : আমারও কিন্তু এটা প্রেমের গল্প মনে হচ্ছে না। আমি যদি প্রেমিক হতাম, পঁচিশ বছর ধরে কি আর পয়লা বৈশাখের জন্য অপেক্ষা করতাম? গোয়েন্দা লাগাতাম, যে করে হোক প্রেমিকাকে খুঁজে বের করতাম।

প্রজ্ঞা : তোমার কি মনে হচ্ছে এটা একটা রহস্য গল্প? ব্যোমকেশের পথের কাঁটা গল্পে কিন্তু এরকমই একটা বিজ্ঞাপন বেরোতো।

সুনন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক এটাই ভাবছিলাম।

অর্ক : আচ্ছা, এটা সেই চাইনিজ কফিশপ মালিকের প্ল্যান নয় তো? রেস্টুরেন্টে খদ্দের বাড়ানোর জন্য...

সুনন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম।

ইন্দ্রাণী : পত্রালীর মা'ই যে সত্যি কথা বলছে, তার কী গ্যারান্টি? পঁচিশ বছর ধরে কী একটা বিজ্ঞাপন প্রতি বছর বেরোতে পারে? অবিশ্বাস্য! তার ওপর কবিতাটার ভাষাটাও ঠিক পঁচিশ বছরের আগের ভাষার সঙ্গে মানানসই নয়।

মদালসা : পত্রালীটা কে?

সুনন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম! পত্রালীটা কে?

ইন্দ্রাণী : কেন? গল্পের নায়িকা, যে গলফগ্রিনে বসে খবরের কাগজ...

মদালসা প্রায় ধমকে ওঠেন, ''পত্রালী নয়, পল্লবী।''

ইন্দ্রাণী : ওহো, সরি, ভুল হয়ে গেছে।

বিবু : ধুর, এসব আমার ভালো লাগছে না। আমি ওপরে শুতে যাচ্ছি।

ইন্দ্রাণী : ঠিক আছে, যা না। বাচ্চাগুলো ওপরে একলা আছে, ওদের একটু সঙ্গ দে।

বিবু উঠে গেল আসর থেকে। তীর্থঙ্কর মদালসাকে বলল, ‘‘কিন্তু মা, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। আমাদের মেলবোর্নের একটা খবরের কাগজ ছিল এম-এক্স। এখন উঠে গেছে। ওখানে রোজ একটা ব্যক্তিগত কলাম বেরোতো। একদিন দেখি কেউ ওতে লিখেছে, ‘তুমি ভারতীয়, তোমার মাথা ন্যাড়া, তুমি রোজ স্প্রিংভেল স্টেশন থেকে সকাল ন'টায় ট্রেনে ওঠো। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। কাল সকাল ন'টায় তোমার সঙ্গে দেখা করবো, এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমি ভাবছি, আমিও তো ভারতীয়। নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে ভাবতে বসলাম, কে এই মেয়টা? যাই হোক, কাল সকালেই দেখা যাবে। পরদিন কাচা জামাকাপড় পড়ে, নিজের অজান্তে একটু বেশিই পারফ্যুম লাগিয়ে বেরিয়েছি। স্টেশনে গিয়ে দেখি, আমার আগেই আরও পাঁচজন ন্যাড়ামাথা ভারতীয় স্প্রিংভেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। কী করব ভাবছি, এদিক ওদিক চাইছি, এমন সময় দেখি একটা গণ্ডগোল বাধছে। কী ব্যাপার? দেখি সেই পাঁচজন ভারতীয়র মধ্যে একজনকে পাকড়াও করে ছাতা দিয়ে পেটাচ্ছে সালোয়ার কামিজ পরা দশাশই এক মহিলা। সঙ্গে পাঞ্জাবিভাষায় বাছা বাছা গালাগালি। সত্যি, গালাগাল দিতে পাঞ্জাবি ভাষার জুড়ি নেই।’’

সুনন্দ : মানে? ব্যাপারটা কী?

তীর্থঙ্কর : আরে, বুঝলে না, সেই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিল লোকটার বউ। লোকটাকে ফাঁদে ফেলার জন্য।

মদালসা যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন বোঝা গেল। রাগচাপা স্বরে বললেন, ‘‘বাবু, সব ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। তোমরা কেউই তাহলে পারলে না। এইভাবে প্রতি বছর খাটাখাটনি করে লোকের চোখের আড়ালে খবরের কাগজের অফিসে আর রেস্টুরেন্টের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন দিতে কি মেয়েরা পারে? বিজ্ঞাপনদাতা আসলে ছেলে।’’

ইন্দ্রাণী : এটা বোধহয় ঠিক হলো না মাসিমা। মেয়েরা এসব কাজে ছেলেদের থেকে কম কীসে? এই সুনন্দকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমাদের ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, ট্যাক্স এসব কে জমা দেয়? ও না আমি? তাছাড়া, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে কি খবরের কাগজের অফিসে যেতে হয়? কলকাতার অনেক পাড়াতেই মুদি দোকানটোকানে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। যাই হোক, আপনি বলুন।

বিরক্তি ঢেকে মদালসা আবার বলতে শুরু করলেন, ‘‘চটপট ফোন লাগালো পল্লবী, সোমা আর ঋতুকে। বিজ্ঞাপনটার কথা শুনে সবারই উৎসাহ, গিয়ে দেখে আসা যাক কে আসে, কার সঙ্গে কার দেখা হয়। সাড়ে দশটার মধ্যেই তিন বন্ধুতে গিয়ে ওখানে হাজির। কিন্তু বসে থাকাই সার, সারাদিন চলে গেল, কাউকেই কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা করতে দেখা গেল না।’’

আদিত্য : সারাদিনে কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করল না, কথা বলল না? সবাই এসে গম্ভীর মুখে চাইনিজ খেয়ে আর বাউল গান শুনে চলে গেল? এটা কিন্তু মাসিমা, ঠিক টাইগার চাচা টাইপ হয়ে গেল।

মদালসা : আহ্, সেরকম না। কেউ যদি কারোর সঙ্গে পঁচিশ বছর পরে দেখা করে, সেটা কি আলাদা করে বোঝা যাবে না?

আদিত্য : বোঝা নাও তো যেতে পারে।

সুনন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম। বোঝা নাও যেতে পারে।

মদালসা : বোঝা যাবেই। শোনো এবার। সন্ধ্যে প্রায় আটটা বাজে। পল্লবীরা উঠবে উঠবে করছে, এমন সময় দেখা গেল সুবেশা এক সুন্দরী বয়স্কা মহিলা হন্তদন্ত হয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। কোণের একটা সিটে গিয়ে বসলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গানে ওনার মন নেই। পল্লবী আর ওর দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। এই বোধহয় সেই মহিলা, যাকে বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে ডেকে এনেছে। কীকরে আলাপ করা যায় ওনার সঙ্গে? বলো তোমরা, কি করে আলাপ করা যায়?

আদিত্য : আমি হলে তো ওনাকে গিয়ে বলতাম, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি, আপনি কী মদালসা দেবী? কী, কেমন আইডিয়া? ভালো নয়?

মদালসা : হলো না, হলো না। পল্লবী গিয়ে বলল, গানটা কী সুন্দর, না মাসিমা? আপনি কি প্রতি বছরই এখানে আসেন গান শুনতে?

আদিত্য : আমার জবাবটা ঠিক কেন নয়?

মদালসা : কারণ, তোমার জবাবটা মোটেও ক্রিয়েটিভ নয়।

আদিত্য : ক্রিয়েটিভ নয়! কেন?

মদালসা : কারণ, আমি বলছি, তাই। তুমি আমার থেকে বেশি বোঝো, ক্রিয়েটিভিটি কাকে বলে?

প্রজ্ঞা : মাপ করবেন, আমি নীরস বৈজ্ঞানিক, রিলেটিভিটি বুঝি, ক্রিয়েটিভিটি বুঝি না। তবে এটুকু আমার মনে হয়, এটা কিন্তু ক্রিয়েটিভিটির পরীক্ষা হচ্ছে না। আপনি যেটা করছেন, সেটা হলো টেলিপ্যাথির পরীক্ষা। আপনি গল্পটা আগেই ভেবে রেখেছেন, আর আপনি কী ভেবেছেন সেটাকেই আমাদের আন্দাজ করতে হবে। এটা কেমনধারা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ?

মদালসা : আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন? আমি, আমি..., ভাবতে পারেন, নিউইয়র্কের এক ট্রেন স্টেশনে

দেখেছিলাম একজন আমার বই নিয়ে...

ইন্দ্রাণী : নিউইয়র্ক থাক। তারচেয়ে মাসিমা, আপনি বরং গল্পটাই বলুন।

মদালসা : ঠিক আছে, নিউইয়র্কের ঘটনাটা বরং পরে বলা যাবে। আগে এটা বলে নিই। শোনো তারপর ... সেই মহিলা বললেন, না আমি তো পঁচিশ বছর পর এই গতকালই দেশে ফিরলাম। আজ রাতের ফ্লাইটেই আবার চলে যাচ্ছি। এই বলে ঘড়িটড়ি দেখে মহিলা তো চলে গেলেন, যথেষ্টই হতাশ দেখাচ্ছিল মহিলাকে। পল্লবী ঠিক করল, না মহিলাকে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করাতেই হবে। সোমার বাবা খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে...”

আদিত্য : হাউ কনভিনিয়েন্ট!

মদালসা : কী?

আদিত্য : না, কিছু না, আপনি বলুন।

মদালসা : হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সোমার বাবা খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে। তাকে ধরে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানাটা জোগাড় হলো। সোমা সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখে...

আদিত্য : ওই ঠিকানায় কোনো বাড়িই নেই।

সুনন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম। গিয়ে দেখল, ফাঁকা মাঠ, ছেলে ছোকরাদের ফুটবল চলছে...

মদালসা : ওফ, না তা নয়। গিয়ে দেখে, লোকে লোকারণ্য। কী ব্যাপার? শোনা গেল, বাড়ির মালিক আজ সকালেই মারা গেছে। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

সারা ঘরে নীরবতা নেমে এল। সবাই সবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কী হলো? আদিত্য বোধহয় আবার বলতে যাচ্ছিল, ‘‘হাউ কনভিনিয়েন্ট!”, কিন্তু ওকে আর মুখ খুলতে না দিয়ে, অপ্রস্তুত অবস্থাটাকে হালকা করতে তীর্থঙ্কর হঠাৎ করেই বলে উঠল, ‘‘আরে, সেই কখন পিজ্জার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, পিজ্জাওয়ালাটার হলো কী?”

আত্রেয়ী বলল, ‘‘বোধহয় ওর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে!”

সারা ঘর সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়ল। শুধু মদালসা সেনই হাসলেন না। রেগেমেগে ধুম ধুম শব্দ করে উঠে গেলেন, ওপরের একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আদিত্য : ওনাকে এভাবে রাগানোটা ঠিক হলো না।

আত্রেয়ী : ইচ্ছে করে করিনি তো। ঠিক আছে, কালকে ভাব করে নেব।

সুনন্দ : গল্পের শেষটা কিন্তু বেশ মৌলিক।

আদিত্য : মৌলিক? সে কী! তুমি অবন ঠাকুরের রাজকাহিনী পড়োনি? শেষটা পুরোটাই রাজকাহিনী থেকে

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

Kasat Marbles
19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001
Ph. No. Office : 2248-9947
Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of
KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858
Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

কপি।

সুনন্দ : রাজকাহিনী, হ্যাঁ, মানে...

আদিত্য : "সন্ন্যাসিনী সেই সোলাঙ্কি রাজকুমারী, আর রাজদেহ বাপ্পার মরদেহ, দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিল, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি", মনে পড়ছে?

আত্রেয়ী : রাজকাহিনী ইজ রাজকাহিনী, দ্যাট ইজ বিয়ন্ড কম্পেয়ার। মাই পয়েন্ট ইজ, আজকালকার বাংলা গল্পগুলো কেন সবসময় এরকম ফ্রাস্টু-খেয়ে-মারা-যাওয়া গোছের হয়? একটু অন্যরকম হলে কী ক্ষতি হয়? তাতে কি গল্পের জাত চলে যায়? তাছাড়া প্রেম ছাড়া কি জীবনের আর কোনো মাত্রা নেই? আমার কিন্তু তীর্থঙ্করের আইডিয়াটা বেশি ভালো লাগল।

অর্ক : গল্পটা বেশ জমে যাচ্ছিল। কিন্তু আরেকটু...

আদিত্য : হ্যাঁ, আরেকটু স্বাধীনতা পেলে...

প্রজ্ঞা : অর্ক, তোমার গল্পটা কিন্তু বাকি রয়ে গেল।

অর্ক : আমার আবার কী গল্প?

প্রজ্ঞা : কেন? ওয়াখান করিডোর, মোয়াব...তারপর ওই যে তুমি বললে, তেমির মুষ্ট। নামটা খুব কম লোকেই শুনেছে। নামটা শুনে পুরোনো কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখন আমেরিকা ফেডারেল সরকারের একটা প্রজেক্টে কাজ করছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স ব্যবহার করে ইন্টারনেটে শত্রুর হদিস খুঁজে বের করা। সেই সময় নামটা বারবার শুনেছি। তেমির মুষ্ট। সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে প্রভাবশালী তালিবান কমান্ডার। পামির, পৃথিবীর ছাদ। কুয়াশা ঘেরা সেই ছাদের অলিন্দে এক বিভীষিকা, চলমান অশরীরী এই তেমির মুষ্ট। কিন্তু তোমার তো ভাই ওই নামটা জানার কথা নয়। যতদূর জানি, ওই নামটা কখনোই বাইরের পৃথিবীর কাছে পৌঁছয়নি।

অর্ক : ও এই ব্যাপার? এটা একটা বড়ো কিছু নয়। ব্যবসার সূত্রে ইরান আর তাজিকিস্তানে এককালে অনেক যাতায়াত ছিল। সেই সময়েই বোধহয় শুনেছিলাম নামটা।

প্রজ্ঞা : আর ওই মোয়াব? তোমার বর্ণনা শুনে মনে হলো, যেন তোমার চোখের সামনেই বোমাটা ফেটেছিল।

অর্ক : পাগল হয়েছেন আপনি? আমি সেখনে থাকলে কি আর এখানে থাকতাম?

প্রজ্ঞা : সে যাই হোক, এই তেমির মুষ্ট লোকটা ভীষণ নির্দয়, আর ততোধিক রহস্যময়। তোমরা নিশ্চয়ই রাসবিহারী বসু বা বাঘা যতীনের ছদ্মবেশ ধারণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা পড়েছো। এই তেমির লোকটাও সেরকম। একবার নাকি এক তালিবান কমান্ডার ওকে একটা গিরিপথের মধ্যে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। গিরিপথের অলিন্দে তুমুল গুলির লড়াই চলছে, এরই মধ্যে ছদ্মবেশ বদলে বেরিয়ে এসেছিল তেমির, বুড়ো একটা তাজিক স্মাগলারের রূপ ধরে। ভীষণ রহস্যময় একটা লোক এই তেমির মুষ্ট। আরও বড়ো রহস্য হলো তালিবানদের ২০২১ সালের আফগানিস্তান দখল। আগের সেই ১৯৯৬-র তালিবানদের সঙ্গে এই নতুন তালিবানদের বিরাট একটা তফাত রয়েছে। আগের তালিবানরা ছিল পাকিস্তানের পেটোয়া। ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের কথা মেনে কাশ্মীরে লাগাতার সন্ত্রাসী মুজাহিদ পাঠাচ্ছিল। এবারও সবাই ভেবেছিল তাই হবে। কিন্তু হল উলটো। ২০২১ সালে ক্ষমতায় এসেই এই নতুন তালিবানরা পাকিস্তানকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করল। আমার একটা সন্দেহ হয়, কী জানো?"

আদিত্য : কী?

প্রজ্ঞা : আমার সন্দেহ, সেই ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে বাজপেয়ী জমানায় একদল ভারতীয় এজেন্ট ছদ্মবেশে তালিবানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ধীরে ধীরে, তালিবানদের শীর্ষ নেতৃত্বদেরকে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে তাদের মেরে ফেলে একটু একটু করে এরা তালিবানদের মাথায় উঠে পড়েছিল। আজকের দিনে শোনা যাচ্ছে, তালিবান কমান্ডারদের অর্ধেকই সেই ১৯৯০ ব্যাচের ভারতীয় এজেন্ট। তাদের মাথা হলো এই তেমির মুষ্ট। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের লোকেদের কাছে শুনেছি, বাইরের পৃথিবীতে লোকটার সম্বন্ধে প্রায় কোনো খবরই পৌঁছয় না। লোকটা যেন এক অদৃশ্য মানব। সর্বত্র আছে, কিন্তু থেকেও নেই। লোকটা একটা বিশেষ ধরনের মার্শাল আর্টে এক্সপার্ট , ও নাকি হাওয়ায় ভেসে লড়াই করে। একটা শত্রুর মাথার ওপর থেকে আরেকটা শত্রুর মাথার ওপর অনায়াসে লাফ দেয়। তাই গোলাগুলি লোকটাকে ছুঁতে পারে না, যেন সুপারম্যান। এরকম অনেক আজগুবি গল্প আছে লোকটাকে নিয়ে। কী জানি, সত্যি কিনা। হয়তো গাঁজাখুরি গল্প, আয়রন লেজেন্ড।

আদিত্য : ভাবতে অবাক লাগে, একদল ভারতীয় এজেন্ট, দেশ ছেড়ে সব আরাম ছেড়ে বছরের পর বছর ওই ঊষর পর্বতমালার মাঝে ওই প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে তালিবান সেজে বসে আছে। কী কষ্টের জীবন! পরিবারের কেউ মারা গেলে তো জানতেও পারবে না ওরা। আমি ওই পরিস্থিতিতে পড়লে তো দুদিনেই পাগল হয়ে যাবো।

প্রজ্ঞা : হুঁ। এরকম পাগলরা ভারতবর্ষ দেশটাতে আজও জন্মায়। নাহলে মানবতার ওপর বিশ্বাস আমার চলে যেত। যাই হোক, চলো দেখে আসি, আমাদের পিজাগুলোর কী হলো। লোকটা কি ভুলে গেল আমাদের অর্ডারটা?

সেদিন রাতে অনেক বছর পরে বাহরাম বুড়োকে স্বপ্নে দেখল অর্ক। তবলার বিড়ের মতো টুপি মাথায়, সাদা লম্বা দাড়ি, বুড়ো থুড়থুড়ে বাহরাম তাজিক এই রুটে ট্রাক চালাতো প্রতি সপ্তাহে। সোভিয়েত সেনার ফেলে যাওয়া ভাঙাচোরা ট্রাক, পাহাড়ে চড়তে গেলেই আর্তনাদ করত। বাজে কোয়ালিটির

ডিজেল খেয়ে দুর্গন্ধ ধোঁয়া ছাড়ত। সেই দুর্গন্ধও ঢাকতে পারতো না বাহরামের শতচ্ছিন্ন কোট থেকে ভেসে আসা ভয়ংকর পচা গন্ধটাকে। বোধহয় বংশ পরম্পরায় ব্যবহার হচ্ছে কোটটা, কোনোকালেই সাবানের স্বাদ পায়নি। আক্সানের বাজার থেকে আফিম কিনত বাহরাম বুড়ো, ট্রাক ভর্তি করে সেই আফিমের প্যাকেট পৌঁছে দিত তিনশো কিলোমিটার দূরে, কমান্ডার নাজারবায়েফের ডেরায়। তার বদলে নাজারবায়েফ ট্রাক ভর্তি করে দিত চীনা অস্ত্রশস্ত্রে। নাজারবায়েফের ডেরা ছিল মাফুশাদ এলাকায়। সেখান থেকে ওয়াখজির গ্রন্থি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাজারবায়েফ ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বড়ো মজার জায়গা সেটা। আফগানিস্তান সেখানে গোঁত্তা মেরেছে তাজিকিস্তান আর চীনা উইঘুরের ঠিক মধ্যিখানে। সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পাকিস্তানের কব্জার বালতিস্তান। লোকে বলে জায়গাটা পাকিস্তানের কব্জায়, কিন্তু বুড়ো বাহরাম হলফ করে বলত, মাঝেমাঝেই নাকি হিন্দুকুশ পাহাড়ের ঐ আনাচে কানাচে জলপাই পোশাক হিন্দু ফৌজের দেখা মেলে। ওরা কি হিন্দুকুশের বদলা নিতে আসে? বুড়োর তাই ধারণা। কুশ মানে হত্যা, যেমন খুদ-কুশি মানে নিজেকে হত্যা, এটাও বুড়ো বলেছিল। সরু পথ, একটা গাড়ির জন্যও যথেষ্ট নয়। উলটো দিক থেকে গাড়ি এসে পড়লে ঝামেলা বেধে যেত। ভাগ্য ভালো, এই রাস্তায় গাড়ির বিশেষ দেখা মেলে না। দেখা মেলে দেদার ভেড়া আর ছাগলের। তারা এসে পড়লে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা। হেল্পার ছোঁড়া ট্রাক থেকে নেমে এসে ছাগল তাড়াতো রাস্তা থেকে, বুড়ো বাহরাম বাঁহাতে স্টিয়ারিং কষে ধরে থাকতো। পালা করে একটু ব্রেক আর একটু অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে যেত, আর বিড়বিড় করে দারি ভাষায় গালাগাল দিত। রাস্তা থেকে ভেড়া ছাগল সরানো অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু গাধা আর খচ্চরদের কথা আলাদা। ওরা পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে। যতই হ্যাট হ্যাট করো আর হর্ন দাও, পথের আইন ভেঙে সাইড দিয়ে যেতে ওদের ভীষণ আপত্তি। জেদ ধরে তারা পথের মাঝখান দিয়েই যাবে, গাড়িকে হতে হবে তাদের অনুসারী। মাঝে মাঝে পথে বরফগলা জলের নদী পড়ত। কাদায় গাড়ির চাকা বসে যেত। কাদা খুঁড়ে চাকা বার করে আবার গাড়ি চালু হতো। ঠাণ্ডায় গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে আরেক চিন্তার কাণ্ড। কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে গাড়ির মনমেজাজ খুশ করতে হতো। এর ওপর বরফের ধস নামলে তো আর কথাই নেই। ঝামেলার অন্ত নেই এই পথে। সস্তা পাকিস্তানি সিগারেট টানতে টানতে 'মজবুরন মজবুরন' বলত বুড়ো। বাধ্য হয়েই এই রুটে গাড়ি চালাচ্ছে সেই হাফপ্যান্ট বয়স থেকে, রোজগারের আর তো কোনো পথ নেই এই এলাকায়।

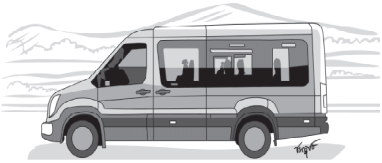

ভোরবেলা। লেকের পাড় ধরে লম্বা একটা রাস্তা চলে গেছে। শহরের প্রান্তে গিয়ে ওটা থেকেই একটা রাস্তা ডানদিকে চলে গেছে। সে রাস্তাটা শেষ হয়েছে জঙ্গলে ঘেরা একটা পার্কে। পার্কটার একদিকে ছোট্ট একটা হ্রদ, তার পেছনেই একটা উপহ্রদ সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। খুব সুন্দর পার্কটা, বাচ্চাদের খেলার জন্য সবরকম ব্যবস্থা আছে, বারবিকিউ করার জন্য খানকতক ইলেকট্রিক বার্নারও আছে। পার্ক থেকে সরু একটা পায়ে চলার রাস্তা সোজা গেছে সমুদ্রতীর পর্যন্ত। পার্কে গাড়ি রেখে সবাই মিলে দলবেঁধে সেই রাস্তা ধরে হাঁটা দিল সমুদ্রতীরের দিকে। ঘন জঙ্গল। কত নাম না জানা গাছ এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ব্যূহ ভেদ করে দেখা যায় না ওদিকে কী আছে, কিন্তু বাতাসের লোনা গন্ধ আর সমুদ্রের সোঁ সোঁ আওয়াজ জানান দিচ্ছে সমুদ্র দূরে নয়। জঙ্গলের রাস্তায় একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ করে যেন সবুজ একটা পর্দা সরে গেল, রোদ ঝলমল সাদা তটরেখা দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালো। বাচ্চারা তো বটেই, ওদের পেছনে বড়োরাও দৌড়োলো জলের উদ্দেশে। মদালসা শুধু নামলেন না, পাড়েই বসে রইলেন। গতকালের রাগ এখনো বোধহয় ঠাণ্ডা হয়নি।

জল থেকে একটু আগেই উঠে এলেন প্রজ্ঞা। গা মুছে, পোশাক বদলে এসে দেখেন মদালসা একলা আছেন। সঙ্গ দিতে ওঁর কাছেই বসলেন প্রজ্ঞা।

''জলে একবার নামলে পারতেন'', বললেন প্রজ্ঞা, ''পারফেক্ট টেম্পারেচার জলটার।''

মদালসা : আপনি নামলেন তো, তাহলেই হলো।

প্রজ্ঞা : রাগ করে বলছেন? ছাড়ুন না। আচ্ছা, আমার কী মনে হয় জানেন?

মদালসা : কী?

প্রজ্ঞা : আপনার নাম মদালসা না হয়ে বনলতা হলে পারতো। বনলতা সেন।

মুখটা কেমন যেন গদগদ হয়ে গেল মদালসার, ''কেন, তাহলে কী হতো? আমাকে নিয়ে কি কেউ কবিতা লিখত?''

প্রজ্ঞা : নতুন করে কেন লিখত? জীবনানন্দের সেই কবিতাটাই তো আছে, সেটাই আবৃত্তি করত।

আমায় দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

আচ্ছা, এই নাটোর জায়গাটা বাংলা কবিতায় একটা হট ব্যাপার, তাই না?

মদালসা : কেন, আর কোথায় নাটোর পেলেন?

প্রজ্ঞা : সেই যে, সেই কবিতাটা, হাঁটো ভাই হাঁটো রে, যেতে হবে নাটোরে। তারপর কী বলুন তো? ও হ্যাঁ, বোধহয় ভালো করে চুল আর গোঁফদাড়ি কাটো রে। তাই না? আচ্ছা, এই কবিতাটা কার লেখা বলুন তো?

''জানি না।'' বেশ রাগতস্বরেই বললেন মদালসা। বনলতা থেকে চুলদাড়িতে এত দ্রুত প্রসঙ্গটা চলে এল, মোটেও ভালো লাগল না সেটা। একটু পরেই বাতাসে ফোলানো একটা বল নিয়ে আবার জলে নামলো তীর্থঙ্কর। দু'তিন ঘণ্টা সমুদ্রে হুটোপাটি করে শেষমেশ সবাই ফিরলো পার্কে। গাড়ি থেকে বেরোলো সসেজ আর রুটি। সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো, কাসুন্দি। বার্নারে একদিকে সসেজ চড়ানো হলো, অন্যদিকে পেঁয়াজ। এতক্ষণ স্নান করে খিদেয় সবারই কাহিল অবস্থা। চটপট হাতে হাতে সবাই সসেজ, পেঁয়াজভাজা আর কাসুন্দি দিয়ে রোল বানিয়ে নিল। খাবারের গন্ধে বাতাস ম-ম। আত্রেয়ী খেয়াল করল, দূরে আরেকটা বারবিকিউ বার্নারে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে খাবার বানাচ্ছে। দেখে ওদের তো ভারতীয়ই মনে হচ্ছে। বয়স বেশি নয়, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশ হবে। দুজনের মধ্যের কথাবার্তার দু' এক টুকরো ভেসে এল এদিকে। ওরা কি বাংলায় কথা বলছে? তাই তো মনে হচ্ছে। অবশ্য ওড়িয়া বা

অসমীয়াও হতে পারে। শুনতে অনেকটা একই রকম লাগে।

আত্রেয়ী : বোধহয় কলকাতার।

ইন্দ্রাণী : বাংলা বললেই কলকাতা কেন মনে হয়? পশ্চিমবঙ্গে কি অন্য কোনো শহর বা গ্রাম নেই?

আদিত্য : সেটা বললে তো প্রবাসী বাঙ্গালিও হতে পারে। হয়তো দিল্লির।

ইন্দ্রাণী : কিংবা বাংলাদেশ। হয়তো ঢাকার।

আত্রেয়ী : ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবো?

আদিত্য : কেন বলোতো?

আত্রেয়ী : এমনি, দেখতাম ওরা কোথাকার।

আদিত্য : জানোই তো, এদেশে অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহলটা অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে। ওরা ওদের মতো আছে, সেটাই থাকতে দাও না।

খাওয়ার পর সবাই জমিয়ে আড্ডা দিতে বসল পার্কে। আদিত্য বলল, ‘‘তোমরা কেউ বিবুকে দেখেছ?’’

‘‘না তো,’’ ইন্দ্রাণী বলল, ‘‘এই একটু আগেও তো এখানেই ছিল। কোথায় গেল?’’

এমন সময় বিবুকে আসতে দেখা গেল পার্কের ওদিক থেকে। পেছনে সেই ছেলেটা আর মেয়েটা।

‘‘এই দ্যাখো, ওদের সঙ্গে আলাপ হলো। ওরা বাঙ্গালি। সুমিত আর শ্রীজা।’’

সুমিত-শ্রীজাও যোগ দিল আড্ডায়। শিলিগুড়িতে বাড়ি দুজনের, এখন দুজনেই ব্রিসবেনে থাকে। একমাসের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে।

‘‘তোমরা কি হাসবেন্ড-ওয়াইফ?’’ মদালসা আচমকা জিজ্ঞেস করলেন।

‘‘মা, থামো।’’ বাধা দিল তীর্থঙ্কর।

মদালসা : কেন? জিজ্ঞেস করলে কি অন্যায় হয়?

সুমিত : না, বিয়ে করিনি, কদিন পরে করব।

মদালসা : তা, বিয়ে না করেই এভাবে...

‘‘মা, চুপ করবে?’’ চাপা গলায় তীর্থঙ্কর বলল।

শ্রীজা : আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মাসিমা। ও ফাজলামি করছে। আমাদের তো গত বছরই শিলিগুড়িতে বিয়ে হয়েছে।

মদালসা : তা, এখানে কোথায় আছো তোমরা? কোন হোটেলে?

শ্রীজা : হোটেলে উঠিনি তো।

মদালসা : তবে, আমাদের মতো কোনো হলিডে হোমে?

শ্রীজা : তাও নয়।

মদালসা : তবে?

শ্রীজা : আমরা গাড়িতেই থাকি।

মদালসা : সেকি!

শ্রীজা : হোটেল বা বাড়ি ভাড়া করে থাকার খরচ অনেক। আমরা এদেশে নতুন এসেছি, এত বাজেট কোথায়? তাই আমরা গাড়িতেই থাকি।

প্রজ্ঞা : তোমরা বোধহয় ক্যারাভ্যান নিয়ে বেরিয়েছো।

শ্রীজা : না, ক্যারাভ্যানের ভাড়া অনেক। আমরা একটা সাধারণ ভ্যানগাড়ি ভাড়া করেছি, ওটাকেই নিজেদের সুবিধে মতো গুছিয়ে নিয়েছি।

আত্রেয়ী : হ্যাঁ, সেটাই দেখলাম, বড়ো একটা কমার্শিয়াল ভেহিকলের পেছনের দিকে ওরা গদি পেতে দিব্বি ঘুমোনোর ব্যবস্থা করেছে। শ্রীজা, সুমিত, এই নাও।’’

আত্রেয়ী টিফিন বক্স খুলে বাড়িয়ে ধরল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল শ্রীজা। সন্দেশ। মুখে দিয়ে আরামে চোখ বুজে ফেলল।

শ্রীজা : কোথায় এমন অপূর্ব নলেন গুড়ের সন্দেশ পাওয়া যায়? মেলবোর্নে? এক্কেবারে বাঙ্গলার সন্দেশের মতো খেতে।

আত্রেয়ী : এটা দোকানের মিষ্টি নয়। আমি বানিয়েছি।

শ্রীজা : বলছেন কী! আমাকে কিন্তু রেসিপিটা দিতে হবে। সুমিতের বাবা-মা যখন আসবে, ওদের খাইয়ে তাক লাগিয়ে দেবো।

খুব আড্ডা জমলো। সুমিত-শ্রীজা এত সুন্দর মিশে গেল ওদের সঙ্গে, যেন অনেক দিনের আলাপ।

আত্রেয়ী বলল, ‘‘এই চলো না, আমরা একটা খেলা খেলি।’’

সুনন্দ বলল, ‘‘কী খেলা? সেই লিটারারি?’’

সবার মুখে চকিতে একটা হাসি খেলে গেল। আত্রেয়ী বলল, ‘‘না না, অন্য খেলা। সবাই নিজের জীবন থেকে খুব অস্বস্তিজনক বা বিব্রতকর একটা অভিজ্ঞতা বলবে। সত্যি ঘটনা বলতে হবে কিন্তু, বানিয়ে বলা চলবে না, কমিয়ে বাড়িয়ে রেখেঢেকে বলা চলবে না। আর সেটা জীবনের সবচেয়ে বিব্রতকর ঘটনা হতে হবে। রাজি?’’

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

আত্রেয়ী : কী হলো? ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। কথা দিচ্ছি, আমিও সত্যি সত্যি একটা অ্যাম্বারাসিং ঘটনা বলবো, আমার জীবন থেকে। ঠিক আছে, আমিই শুরু করছি। তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। একটা ছেলে ছিল ক্লাসে, আমার খুব ভালো লাগতো ওকে। স্কুলের শেষ দিন, টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। কারোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তাই ছেলেটাকে বলে ফেললাম আমার মনের কথা। ছেলেটা মুখের ওপরেই বলে দিল, আমার ওপর ওর কোনো আগ্রহ নেই। কী লজ্জা। শুধু তাই নয়, কলেজে ভর্তি হয়ে দেখি, আমারই কলেজে ভর্তি হয়েছে ছেলেটা। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই পুরো কলেজ জেনে ফেলল সবকিছু। পুরো দুবছর, যতদিন না উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলাম, রোজদিন এই লজ্জা আমার পেছনে তাড়া করে বেড়িয়েছিল।

সুনন্দ : এটা ঠিক বিব্রতকর ঘটনা নয়, হাসির ঘটনা তো মেটেই নয়। আমার বরং ছেলেটার ওপর রাগ হচ্ছে। যাই হোক, এবার আমি বলছি। ছোটোবেলায় দু'এক সপ্তাহ বেহালা বাজনো শিখেছিলাম। ব্যাস্ ওইটুকুই। ক্লাস নাইনে উঠে নতুন একটা কোচিং ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। শিক্ষক সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলেন, কার কোন শখ। আমার কী মতিভ্রম হলো, বললাম আমার শখ বেহালা বাজানো। ব্যাস, উনি পাশের ঘর থেকে একটা বেহালা এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, আমারও তো শখ বেহালা বাজানো। বাজাও, বাজাও। ছিঃ ছিঃ! ঘরভর্তি ছেলে-মেয়ের সামনে সেই ছোটোবেলায় শেখা দু'এক কলি প্যাঁওপ্যাঁও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজালাম। শেষে ধৈর্য হারিয়ে উনি অমার হাত থেকে বেহালাটা কেড়ে নিলেন। সে কী বিরক্তি ওনার মুখে।

শ্রীজা : এবার আমি বলি? গত বছর গোল্ড কোস্টের সী ওয়ার্ল্ড ওয়াটার পার্ক গেছিলাম। হরেক রকম রাইড, তার মধ্যে একটা ছিল বিশাল উঁচু একটা ওয়াটার স্লাইড। বোধহয় দশতলা সমান উঁচু হবে। ওপরে তো উঠেছি, এবার স্লাইড দিয়ে পিছলে নীচে নামতে হবে। নীচে তাকিয়ে রীতিমতো ভয় করতে লাগল। এদিকে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দুটো বাচ্চা ছেলে, এক বুড়োবুড়ি, তাদের পেছনে সুমিত। আমি বাচ্চাদুটোকে জায়গা ছেড়ে দিলাম। ওরা বিন্দাস লাফ দিল, ইইইইইই চিৎকার করে স্লাইড গড়িয়ে নীচে নেমে গেল, ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল। আমার পরে সেই বুড়োবুড়ি, তাদেরও জায়গা ছেড়ে দিলাম, তারাও লাফ দিল। আমার পরে সুমিত, ওকেও জায়গা ছেড়ে দিলাম। এবার আর উপায় নেই, আমাকে লাফাতেই হবে। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে ডাকছি। দেখি নীচ থেকে সুমিত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওপর থেকে লাফ মারলাম জয় মা বলে। আমাকে লাফাতে দেখে সুমিত হাততালি দিল। সেই বুড়োবুড়ি, বাচ্চাদুটো, সবাই হাততালি দিল। আমি দমবন্ধ করে গিয়ে পড়লাম জলে। জলে পড়েই চোখ বুজে এলোপাথাড়ি হাত পা চালাতে লাগলাম, ডুবে না যাই। সুমিত পাশ থেকে ধমক দিল, হাত পা ছোঁড়া বন্ধ করো। তুমি কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছো, চেষ্টা করলেও ডুবতে পারবে না। চোখ খুলে দেখি সত্যিই তাই। আর দেখি, সেই বুড়োবুড়ি আর সেই বাচ্চাদুটো আমার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছে। তখন খেয়াল করলাম, স্লাইডটা মোটেও দশতলা উঁচু ছিল না।"

''অর্ক, এবার তুই বল,'' বলল সুনন্দ।

''আমি?'' ভাবনায় পড়ে গেল অর্ক, ''সবচেয়ে বিব্রতকর ঘটনা...''

আরেকটু ভেবে অর্ক বলল, ''আমি যেটা বলছি, সেটা একটু, মানে, যাকে বলে নোংরা। মাপ করে দিস। কলেজে পড়তে তো অনেক ট্রেকিং করেছি, দক্ষিণ হিমালয় ধরে। সুনন্দ জানে সেকথা। একবার সান্দাকফু থেকে ফালুট ট্রেকিংয়ে গেছিলাম। সান্দাক্‌ফুর কাছেই একটা গ্রামে সেই রাতে ডেরা বেঁধেছি। সেদিন রাতে একটু বদহজম হয়েছিল। ভালো ঘুম হয়নি। ভোর হওয়ার আগেই পেটের ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল। প্রায় ভোর চারটে নাগাদ জল গরম করে, সেই জল বোতলে ভরে দৌড় দিয়েছি গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে।"

''হোয়াই হট ওয়াটার?'' নিকোল বলল।

''খুব ঠাণ্ডা জায়গা, ভোরের দিকে জল চট করে বরফ হয়ে যায়। তাই গরম জল। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। এরকম গ্রামে তো আর সেকালে বাথরুম হতো না, মাঠেঘাটে কাজ সারতে হতো। সাধারণত আমি লোকালয় ছেড়ে একটু জঙ্গলমতো জায়গায় গিয়ে গর্ত খুঁড়ে প্রাতঃকৃত করতাম। সেদিন তার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল না। কাকভোর, তখন সূর্য ওঠেনি। আকাশটা ঘন নীল। গ্রাম থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়ের দিকে গেছে, তার ধারেই একটা পাথরের খাঁজে উঠে বসেছি আমি। সবে করতে যাব, দেখি এক রাখাল কয়েকটা ভেড়া নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছে। আমি মনে মনে বলছি, হে ভগবান, এদিকে যেন না তাকায়। আমার ঠিক এক মিটারের মধ্যে ছেলেটা এসে পড়েছে। ঠিক এই সময়, ছেলেটা মাথা উঁচিয়ে আমার দিকে তাকালো। ওহ্! এর পর কী আর কিছু করা যায়? আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ছেলেটা কখন চলে যায়, তার জন্য। ছেলেটা এদিক ওদিক দেখতে দেখতে গান গাইতে গাইতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবার আমি সবে করতে গেছি, দেখি আরেক রাখাল আসছে। ওহ্! আবার আটকে গেল। একের পর এক, এই চলতে লাগল। কটা রাখাল থাকে এই গ্রামে। যখন আমার প্রাতঃকৃত্য শেষ হলো, দেখি যে জলের বোতলটা এনেছিলাম, তার জল জমে বরফ হয়ে গেছে। পরিষ্কার হওয়ার কোনো উপায় নেই।"

''ওয়াক। কী নোংরা ব্যাপার।'' ইন্দ্রাণী বলল।

আমার জীবনের সবচেয়ে বিব্রতকর ঘটনাটা বলা সম্ভব ছিল না, মনে মনে বলল অর্ক। সেই অন্য গল্পটা কিন্তু এই গল্পটার থেকে অনেক বেশি ইন্টরেস্টিং হতো...

ইন্দ্রাণী বলল, ''এবার আমি বলি? এটা একটা ভুলভাল ভাষা বিভ্রাটের ঘটনা। হলো কী, আমি তখন নটিং হিল থানায় পোস্টেড ছিলাম।"

মদালসা : থানায় পোস্টেড মানে? তুমি কি পুলিশ নাকি?

ইন্দ্রানী : হ্যাঁ মাসিমা, আপনি জানতেন না বোধহয়? আমি ভিক্টোরিয়া পুলিশে চাকরি করি। যাই হোক, নটিং হিলে ইদানীং অনেক চীনা অভিবাসী বাড়ি কিনেছে। এদিকে আমি স্কুলে থাকতে ম্যান্ডারিন ভাষা পড়েছিলাম।

মদালসা : ম্যান্ডারিন কোন ভাষা?

ইন্দ্রানী : ম্যান্ডারি হলো চাইনিজ মেনল্যান্ডের প্রধান ভাষা।

মদালসা : ও, চাইনিজ ভাষা!

ইন্দ্রাণী : না মাসিমা, যেমন ইন্ডিয়ান ভাষা বলে একটা কোনো ভাষাকে বোঝায় না, তেমন চাইনিজ ভাষা বলেও একটা কোনো ভাষা নেই। অনেকগুলো ভাষা আছে চীনে, তার মধ্যে ম্যান্ডারিন হলো সরকারি ভাষা।

মদালসা : তুমি কি এখানে পড়াশোনা করেছো?

ইন্দ্রাণী : হ্যাঁ মাসিমা, আমার জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা সব এখানেই। এখানে স্কুলে ঐচ্ছিক হিসেবে ম্যান্ডারিন, জাপানি, ইন্দোনেশিয়ান, এমন অনেক এশিয়ান ভাষাই নেওয়া যায়। কিন্তু চর্চা না রাখলে ওটুকু শেখায় কোনো কাজ হয় না। এদিকে সরকারিভাবে আমার রেকর্ডে আছে, আমি ম্যান্ডারিন জানি। একবার একটা লোক গ্রেফতার হলো, সিটবেল্ট না পরে গাড়ি চালাচ্ছিল। পুলিশ লোকটাকে জরিমানা করার চেষ্টা করেছিল অনস্পট, কিন্তু কিছুতেই লোকটাকে বোঝাতে পারেনি লোকটার অপরাধ কী। লোকটা শুধু এটাই বলতে পেরেছে, 'নো ইংলিশ'। বাধ্য হয়ে লোকটাকে থানায় ধরে আনা হয়েছে। সেটা ছিল ক্রিস্টমাসের সময়, থানার বেশিরভাগ অফিসারই ছুটিতে। কেউ নেই যে ভালো ম্যান্ডারিন জানে। অগত্যা আমার ডাক পড়ল। আমি অনেক কষ্ট করে লোকটাকে বোঝালাম ব্যাপারটা। ওমা, লোকটা দেখি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে মুখে রীতিমতো ভয়। কী ব্যাপার, আমি কি কিছু ভুল বললাম? বোধহয়। ভাগ্য ভালো, এই সময় একজন অফিসার এসে পড়ল যে ম্যান্ডারিন ভালো জানে। আমি তার সামনে আবার বললাম ব্যাপারটা। আমার কথা শুনে সেই অফিসার নিজের পেট চেপে ধরে ফাজিল বখাটে ছোঁড়াদের মতো খিক খিক খৌ খৌ হাসতে শুরু করল। আমি ধমক লাগালাম, কী ব্যাপার, হাসি থামিয়ে একটু বুঝিয়ে বলবে? ধমক খেয়ে হাসি থামলো, অফিসার আমাকে বলল, তুমি 'সিটবেল্ট' বোঝাতে যে ম্যান্ডারিন শব্দটা ব্যবহার করেছো, সেটার মানে আসলে 'ফাঁসির দড়ি'। তার মানে, লোকটাকে তুমি এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করছিলে, লোকটা ফাঁসির দড়ি গলায় না বেঁধে গাড়ি চালিয়েছে, সেটাই ওর অপরাধ! নতুন এসেছে এ দেশে, এখানকার আইনকানুন বিশেষ জানে না। রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। ছি ছি, কী লজ্জা!

আড্ডা আরও কতক্ষণ চলতো জানা নেই, হঠাৎ আদিত্যর খেয়াল হলো, ''আরে, সাড়ে দশটা বাজে। চলো, চলো, চেক আউট করতে হবে। তারপর জাহাজ। দেরি হয়ে গেল। সুমিত, শ্রীজা, তোমরাও চলো না কেন আমাদের সঙ্গে, ক্রোয়াজিঙ্গলং ন্যাশনাল পার্ক? খুব মজা হবে।''

''যাবে?'' শ্রীজা জিজ্ঞেস করল সুমিতকে।

''আমাদের যে অন্যরকম প্ল্যান আছে। তাছাড়া, আমরা আপনাদের ঠিক উলটো দিকে যাচ্ছি।'' সুমিত বলল।

বাড়িটা ছাড়ার সময় সবারই একটু মন খারাপ হচ্ছিল। ইন্দ্রাণী বলল, ''এখানে এত সুন্দর ব্যবস্থা, সেসব ছেড়ে আমরা যাচ্ছি কোন জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে। ভালো হতো এখানেই থেকে গেলে।''

''তাতে কি আর অ্যাডভেঞ্চার হতো?'' বলল সুনন্দ, ''তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গলে থাকার মজাই আলাদা! আদিম জীবন। মুক্ত, স্বাধীন।''

''হয়েছে, খুব হয়েছে।''

ঠিক সাড়ে এগারোটায় ছোট্ট একটা জাহাজ ছাড়লো ঘাট থেকে। ধীরেসুস্থে দুলকি চালে বন্দরের মায়া কাটিয়ে এগিয়ে চলল লেকের গভীরে। এটা একটা একলা লেক নয়, প্রায় ৬০০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে অনেকগুলো লেক, জলা আর ল্যাগুন নিয়ে এই গিপ্সল্যান্ড লেক সিস্টেম, সেটা গিয়ে মিশেছে কুমেরু মহাসাগরে। লেকের দক্ষিণ ধার ধরে সরু বালির পাড়, তার ওপারে আদিগন্ত সমুদ্র।

দোতলা জাহাজ, ওপরের তলায় খোলা ছাদ। সবাই মিলে সেখানে বসেছে, খুব আড্ডা চলছে। শুধু প্রজ্ঞাই এ সবের মধ্যে থেকেও একলা রেলিংয়ের ধারের সিটে বসে একমনা হয়ে প্রকৃতির হুল্লোড় দেখে যাচ্ছে। প্রকৃতি সেজন্যই বোধহয় তার সম্ভার উজার করে দিয়েছে। জলের ওপর ভাসছে উড়ছে অগুনতি সামুদ্রিক পাখি, ওদের সাদা রং ঘন নীল জলের ক্যানভাসে যেন নিপুণ তুলির মাস্টারস্ট্রোক। জায়গায় জায়গায় মাথা উঁচিয়ে উঠছে জলটুঙ্গি, ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা। মাঝে মাঝে খাপছাড়া একটু করে বাদামি আর ছাই-ছাই রঙের পাথর দেখা যায়, সবুজের ঘেরাটোপে বন্দি। সবুজই কত না রঙের। তার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে ওদের জাহাজ।

আদিত্য নিজের সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে প্রজ্ঞার সামনের একটা সিটে বসল।

আদিত্য : আচ্ছা, আপনি যে সেই লোকটার কথা সেদিন বলেছিলেন, খুব ইন্টারেস্টিং। বারবারই লোকটার কথা মনে হচ্ছে। কেন যে কেউ এরকম একটা ক্যারেক্টারকে নিয়ে বাংলায় সিনেমা বানায় না! আচ্ছা, লোকটাকে কি আপনি কখনও দেখেছেন? কোনো ছবি....

প্রজ্ঞা : কে, তেমির মুষ্ট?

আদিত্য : হ্যাঁ, সেই ছদ্মবেশী গুপ্তচর। কিন্তু গুপ্তচরই-বা বলি কীকরে, গুপ্তচর তো শুধু খবর সংগ্রহ করে। এই লোকটা তো তার থেকেও অনেকটা এগিয়ে গেছে। কী দুর্দান্ত একটা ক্যারেকটার।

প্রজ্ঞা : হুঁ, লোকটার এমন সব কীর্তিকলাপ আছে, যেগুলো রূপকথা বা কল্পবিজ্ঞান কাহিনির পর্যায়ে পড়ে যায়। তাই বেশি কিছু বলতে ভয় করে। তোমরা ভাববে, এই বুড়িটার ভীমরতি

হয়েছে।

আদিত্য : এরকম দু'একটা ঘটনা বলুন না, প্লিজ। আমরা কিচ্ছু ভুলভাল ভাবব না।

প্রজ্ঞা : জিজ্ঞেস করছিলেন না, লোকটাকে দেখেছি কিনা? হ্যাঁ, লোকটার একটা ভিডিয়ো দেখেছিলাম। ছোট্ট একটা ভিডিয়ো ক্লিপ। ওটুকুই হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। লোকটার চেহারা কিন্তু আহামরি কিছু নয়, বিশেষত্বহীন। লম্বায় এই অর্কর মতোই হবে। ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা। মাথাভর্তি লম্বা চুলের জটা। চোখদুটো শুধু অস্বাভাবিক। অন্ধকার কোটরের মধ্যে আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে। আমেরিকান সৈন্যরা একবার লোকটাকে ধরে ফেলেছিল। অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, পেট থেকে কথা বের করতে। কিছুতেই কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে শেষে লোকটাকে একটা সনার মধ্যে আটকে রেখে দিল। সনা মানে বুঝেছ তো? কাঠের তৈরি একটা ঘর, সম্পূর্ণ তাপরোধী। তার মধ্যে কয়লা পুড়িয়ে ভেতরের তাপমাত্রা ইচ্ছেমতো বাড়ানো যায়। সেখানে লোকটাকে রেখে ঘরের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে গেল সিআইএ-র লোকেরা। যাতে যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করতে থাকে, বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। পুরো ঘটনাটার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করেছিল ওরা। সেই ভিডিয়োতে দেখলাম, চেয়ারে বাঁধা লোকটা দরদর করে ঘামছে। লাল হয়ে গেছে লোকটার সারা শরীর। দেখলাম, লোকটা হঠাৎ ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল। ঘরের উত্তাপ যত বাড়ছে, লোকটার কাঁপুনি ততই বাড়ছে। শেষে এক অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত কাঁপতে লাগল। এত দ্রুত, যে লোকটার ছবিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। তারপরেই দেখি, লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এক দৌড়ে লোকটা ঘরের দেওয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল। সনার ওই পুরু কাঠের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। ব্যাস, তারপর লোকটা উধাও। এরপরেই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা নজরে পড়ল। যে হাতকড়া দিয়ে লোকটাকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেটা দিব্যি অটুট আছে। লোকটা কী করে হাতকড়া গলে বেরিয়ে গেল, কেউ জানে না। সিআইএ-র ভিডিয়ো, তাই বিশ্বাস করতে হলো। নাহলে ভাবতাম, কেউ সিনেমা বানিয়েছে।

সবাই চুপ।

কিছুক্ষণ পরে মদালসা বললেন, ‘‘গাঁজাখুরি গল্প। এসব অবাস্তব গল্প শুনলে চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের উচিত, বাস্তবধর্মী গল্পের চর্চা করা। যদি তোমরা চাও, আমার বন্য শরীরের হাহাকার উপন্যাসটা থেকে কিছু গল্প আমি বলতে পারি তোমাদের। শুনবে?’’

‘‘ঠাণ্ডা বাতাস বইছে,’’ আত্রেয়ী বলল, ‘‘আমি নীচে যাচ্ছি।’’

প্রায় এক ঘণ্টা পরে জাহাজ নোঙ্গর গাড়লো মিটাংয়ে।

ছোট্ট নিরালা শহর মিটাং, তিনদিক জলে ঘেরা। লেকের পাড়ে কাঠের তৈরি রেস্টুরেন্ট। মশলা মাখানো ঝলসানো স্থানীয় মাছ, টাটকা স্যালাড, লেবু আর টারটার সস, শেষে মিষ্টিমুখ আইসক্রিম দিয়ে। দুপুরের খাবারটা ভালোই হলো। তারপর দল বেঁধে সবাই মিলে শহরটা ঘুরে দেখে এল। নিঃঝুম, ঘুমন্ত শহর, ছবির মতো সুন্দর। দুপুরবেলা, তাই বোধহয় সব দোকানই বন্ধ। দুঘণ্টা বাদে জাহাজ ছাড়লো, লেকস এন্ট্রান্সের উদ্দেশে। আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। মাঝরাস্তায় তুমুল বৃষ্টি এল। সবাই দুড়দাড় করে নীচে কেবিনে চলে গেল। ওপরে রয়ে গেলেন শুধু প্রজ্ঞা। বৃষ্টির সঙ্গেই প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে, সমুদ্র হচ্ছে উথালপাথাল।

‘‘প্রজ্ঞা, নেমে এসো নীচে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।’’ নীচ থেকে হেঁকে বলল সুনন্দ।

‘‘সরি ভাই, লাখ টাকা দিলেও আমি এই দৃশ্য ছেড়ে নীচে নামছি না।’’ বললেন প্রজ্ঞা।

‘‘অসুখ করবে যে।’’

‘‘করলে তখন দেখা যাবে। ওষুধ আছে কী করতে?’’

‘‘তুমি একটা পাগল বুড়ি। এই বয়সে...’’ গজগজ করতে করতে সুনন্দ আবার ঢুকে পড়ল একতলার কেবিনে। প্রজ্ঞা তখন ঝড়ের লেকের দৃশ্যে মশগুল।

শ্রীজার মনটা খারাপ হয়ে আছে।

—অ্যাই সুমিত।

—বলো।

—ওদের সঙ্গে সেই জিংজং না কী যেন জঙ্গলটার নাম...

—ক্রোয়াজিঙ্গলং।

—হ্যাঁ, সেই জঙ্গলটাতে গেলে হতো না?

—আমাদের প্ল্যানটা তো অন্য।

—সবসময় কি পরিকল্পনা অনুসারে চলতে হয়? আমরা তো বেরিয়েইছি বেড়াতে। কোনো পরিকল্পনা মেনে ঘুরছি কি? তাছাড়া পরিকল্পনার তো পরিবর্তন হতেই পারে।

—এখানে হঠাৎ করে পরিকল্পনার পরিবর্তন করার দরকার পড়েছে কি?

—ওদের সঙ্গে ঘুরতে গেলে ভালো হতো না? কত ভালো লোক ওরা, কত আগ্রহ করে বলল আমাদের, ওদের সঙ্গে যেতে...

—সন্দেশটা কি এত ভালো ছিল, যে...

—ঠাট্টা নয়।

—ওই বয়স্ক মহিলা, আমাদেরকে ওনার ভালো লাগেনি। তুমি তো জানো, এসব ক্ষেত্রে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব ভালো কাজ করে। ওদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোলে নির্ঘাত ওই মহিলার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধতো। অনেক কষ্ট করে এই বেড়ানোটার ব্যবস্থা করেছি আমরা, সেটা এরকম সামান্য কারণে নষ্ট হোক, তা কি তুমি চাও?

রাস্তা থেকে গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে পার্ক করল সুমিত। পার্কিংয়ের পাশেই একটা টিলা, তার ওপরে কাঠের প্ল্যাটফর্ম।

—কী এটা? শ্রীজা বলল।

—এটা একটা সিনিক ভিউ স্পট। এখান থেকে সবকটা গিপ্সল্যান্ড লেক আর তার পেছনের সমুদ্র একসঙ্গে দেখা যায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে কয়েক সারি জঙ্গল। তার ওপারে একরাশ জল, নীলচে সবুজ রং। টুকরো টুকরো জলাশয়, জঙ্গলের প্রবেশ তাদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। জলের ওপারে বালির পাড়, আরও জঙ্গল। সবুজে আর ছাইরঙে মেশা ঘন বন। সেই বনের ওপারে আবার জল। সবশেষে রাশি রাশি ঘন নীল, দিগন্ত পর্যন্ত এলিয়ে আছে। ঘন নীল সেই সমুদ্রে হালকা নীল আকাশ মিশেছে, যেন দিকচক্রবাল বরাবর দুই নীলের সলাজ অভিসার চলছে। অভ্রকণার মতো সাদা সাদা অজস্র বিন্দু ঝিকমিক করছে সমুদ্রের ওপর। আকাশে ইতিউতি উড়ছে রানিরঙের মেঘ।

সুমিত : এটা না দেখলে বিরাট ভুল হতো, তাই না?

শ্রীজা : হ্যাঁ।

সুমিত : তাহলে আমাকে ক্ষমা করছো?

শ্রীজা : কী জন্যে?

সুমিত : ওদের সঙ্গে যে গেলাম না, তার জন্য।

শ্রীজা ডানহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল সুমিতকে। দুজনে অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ আগেই আকাশ জুড়ে রাশি রাশি গেরুয়া রঙের আবির ঢেলে সূর্য অস্ত গেল। লেকের ওপর ভাসমান চৌকো একটা নৌকো, রেস্টুরেন্ট। সন্ধ্যে নামছে লেকের জলে, আলো নিভিয়ে টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আকাশে তখন রঙের মেলা। নীল থেকে ঘন নীল, তার মাঝে লাল, লালের মধ্যে আবার গোলাপি রঙের ছটা। কাঁচের দেওয়াল চুঁইয়ে আকাশের সব রং নেমে এসেছে রেস্টুরেন্টের মধ্যে। অনেক পাখি, ভাসছে আর উড়ছে লেকের জলে। খাবার আসতে দেরি হলো, কিন্তু দেরি পুষিয়ে গেল স্বাদে। আস্ত একটা মাছ এল, মশলা দিয়ে ঝলসানো, ওপরে ধনেপাতার কুচি। শেষে আইসক্রিম ভাজা।

"ইশ, দেরি হয়ে গেল, ক্রোয়াজিঙ্গলং পৌঁছোতে বেশ রাত হয়ে যাবে," বলল সুনন্দ।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলো আদিত্য। আকাশে জলেতে তখন কালচে নীল মিশে একাকার। শুধু দিকচক্রবাল ভাস্বর হয়ে আছে উৎসবিহীন এক অপার্থিব উজ্জ্বল ছটায়।

বিউগলের তীব্র শব্দে চমকে উঠল অর্ক।

মধ্যভারতে গ্রীষ্মের গরম অসহ্য। সারাদিন ধরে সূর্যের তাপ সঞ্চয় করতে থাকে পাথরের মেঝে, তাই অনেক রাত পর্যন্ত সে মেঝে ঠাণ্ডা হয় না। দুটো বেঞ্চি জোগাড় করে দোতলার বারান্দায় সে দুটোকে জোড়া করে তার ওপর চাটাই বিছিয়ে শুয়েছিল অর্ক। তড়াক করে উঠে বসল। দেখল, নীচে মাঠের ওপর দিয়ে চার-পাঁচজন লোক দৌড়ে যাচ্ছে। বিউগলের এই সুরটা...রাত্রিবেলা হঠাৎ বিউগল বাজছে কেন? হঠাৎ করেই জলের মতো সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের ক্যাম্প আক্রান্ত হয়েছে। কে আক্রমণ করেছে? নীচ দিয়ে ওই লোকগুলো দৌড়াচ্ছে ওরা কি?

কাছে একটা ভাঙ্গা বেঞ্চি পড়ে ছিল। 'হেঁইয়ো মারি' বলে সেটাকে মাথার ওপর তুলে গায়ের সব জোর দিয়ে ছুঁড়ে মারল অর্ক, লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। লোকগুলো অর্তনাদে 'এন্দে ঈশ্বরা' না কী যেন বলে উঠল, হাত দিয়ে মাথা ঢেকে আরও জেরে দৌড় দিল। এই সময় কে যেন জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক দিল, 'পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়ছ কেন? বিউগলের সুরটার মানে জানো না?'

ও, তার মানে এটা কোনো আক্রমণ নয়। এটা নিশ্চয়ই একটা অভ্যাস। অথবা পরীক্ষা। অর্ক দেখল, বিউগলের মন্ত্রবলে ইতিমধ্যেই ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠেছে, তড়িঘড়ি সবাই ইউনিফর্ম পড়ছে। অর্কও হাত চালিয়ে তৈরি হয়ে পাশে রাখা লাঠিটা তুলে দৌড় দিল ক্যাম্পের কেন্দ্রস্থলের দিকে। ওখানে একটা সভাগৃহ ধরনের কিছু আছে। পঙ্‌ক্তিভোজন থেকে বৌদ্ধিক ক্লাসগুলো সব সেখানেই হয়। তড়িঘড়ি সেই সভাগৃহে ঢুকে দেখল, ততক্ষণে প্রায় সবাই সেখানে পৌঁছে গেছে। অন্ধকার সভাগৃহের শুধু মঞ্চে আলো রয়েছে, সেখানে অখণ্ড ভারতের বিশাল মানচিত্র, ভারতমাতার ছবির নীচে ধূপ জ্বলছে।

"১৯৪৭ সালের এক রাতে," মঞ্চ থেকে শোনা গেল

সম্মোহক কণ্ঠস্বর, ‘‘ঠিক এইভাবে বিউগল বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। ট্রেনিং অসমাপ্ত রেখে সবাইকে ফিরে যেতে হয়েছিল...’’

চোখ জ্বালা করছিল অর্কর। ধূপের ধোঁয়ার জন্য? গলার কাছে কী যেন ঘোঁট পাকাচ্ছিল। বাবার কাছে ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছে মেঘনার পাড়ের সেই ছায়ানিবিড় গ্রামটার কথা। এক কাপড়ে ফেলে আসা সেই গ্রাম। বাবা সারা জীবন ছটফট করেছিল, আর একবার সেই গ্রামটা চোখের দেখা দেখে আসতে চেয়েছিল। তুলসীমঞ্চের নীচে শালগ্রামশিলাকে লুকিয়ে পুঁতে রেখে আসা হয়েছে, সেই কুলদেবতাকে নির্বাসন থেকে উদ্ধার করতে হবে। সেই বিক্রমপুর, চাঁদপুর, ঢাকা...কোনো এক অলৌকিক মন্ত্রবলে প্রতিটি জন্মের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছিল অর্কর চোখের সামনে।

এই চোখে, এই দেহে আবার মায়ের অখণ্ডমূর্তি দেখব। যতদিন না সে স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে, ততদিন বিশ্রাম নেব না। এ আমার অখণ্ড প্রতিজ্ঞা।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় চমকে উঠল অর্ক।

‘‘হ্যাঁ?’’ বলল সুনন্দ, ‘‘কিছু বললি?’’

‘‘উঁ?’’ ঘুম ভেঙে তাকালো অর্ক।

‘‘কী যেন বিড়বিড় করছিলি ঘুমের মধ্যে?’’ বলল সুনন্দ, ‘‘ইয়াচি দেহী ইয়াচি ডোলা...এরকম কিছু একটা বলে উঠলি। ঠিক বুঝতে পারলাম না।’’

‘‘কী জানি, এমন তো কিছু মনে পড়ছে না। ভুল শুনেছিস হয়তো।’’

‘‘একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি। তুই হঠাৎ হঠাৎ করেই ঘুমিয়ে পড়ছিস, আর তারপরেই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিস। এগুলো সবই কিন্তু পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসের লক্ষণ। তোর কী হয়েছে, বল তো? তোর সঙ্গে কি কোনো বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে?’’

গাড়ির অল্প খোলা কাচের ফাঁক দিয়ে রাত্রির জঙ্গলের ঠাণ্ডা বাতাস থাপ্পড় মেরে চলেছে ক্রমাগত। একটু কাত হয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়ে কাচ বন্ধ করে দিল অর্ক।

অন্ধকার নেমেছে। দুধারে জঙ্গলের দেওয়াল, কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু, মিশকালো। নিশ্ছিদ্র কালো ফ্রিওয়ে। বাতাসের ঝাপটা ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে গাড়ির ওপর, তার ঘর্ষণ সমুদ্রের গর্জনের মতো আওয়াজ তুলছে। গাড়ির কাঁচ সব তোলা, গাড়ির ভেতরও অন্ধকার। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞা জেগে বসে আছেন ড্রাইভারের পাশের সিটে। লম্বা রাস্তায় ড্রাইভারকে সঙ্গ দিতে কারোর না কারোর জেগে থাকা উচিত। সবাই যদি ঘুমিয়ে পড়ে, দেখা যায় ড্রাইভারেরও জেগে থাকতে কষ্ট হয়। আর ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি যখন প্রায় উড়ে চলেছে, তখন এক সেকেন্ডের ঝিমুনিই যথেষ্ট। পলকের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু ঘুম ভাঙার আগেই ছোবল মারবে। সবচেয়ে ভালো হয় ড্রাইভারের সঙ্গে টুকটাক গল্প চালিয়ে গেলে।

প্রজ্ঞা : আদিত্য, তুমি ভারতে কবে যাচ্ছ?

আদিত্য : এই তো, সামনের মাসেই।

প্রজ্ঞা : বাঃ, তখন তো কলকাতায় বইমেলা চলবে।

আদিত্য : হ্যাঁ, সেটাই ইচ্ছে। কলকাতা বইমেলায় ঘুরবো, তারপর জানুয়ারির শেষের দিকে মুম্বাই যাব।

প্রজ্ঞা : তোমার ফ্যামিলি কি মুম্বাইয়ে?

আদিত্য : হ্যাঁ, আমার বাবা তো টাটা মেমোরিয়ালে ডাক্তার ছিলেন, ওখানেই অবসর নিয়ে থানেতে বাড়ি করেছেন।

প্রজ্ঞা : তাহলে কলকাতা যাচ্ছ যে? শুধু বইমেলার জন্য?

আদিত্য : না, আত্রেয়ীর বাড়ি তো কলকাতায়, টালিগঞ্জে। তাই, ভারতে যখন যাচ্ছি, তখন শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন তো কাটাতেই হবে।

প্রজ্ঞা : ভালোকথা মনে পড়ল। তুমি যখন মুম্বাই যাচ্ছ, তখন আমার একটা কাজ করে দেবে? অসুবিধে না হলে।

আদিত্য : নিশ্চয়ই। কী বলুন?

প্রজ্ঞা : অমর চিত্র কথা বলে একটা কমিকস পাওয়া যায় ভারতে। ওদের পাবলিশিং অফিস মুম্বাইতেই। ওই কমিকসের একটা ফুল সেট আমার জন্য অর্ডার দিতে হবে, আর ওরা যেন সেটা আমার তাসমানিয়ার বাড়ির ঠিকানায় পোস্ট করে দেয়।

আদিত্য : অমর চিত্র কথা। প্রতি মাসে আসতো আমাদের বাড়িতে, খবরের কাগজওয়ালা দিয়ে যেত। কী সুন্দর সব হাতে আঁকা ছবি থাকত। আমার এখনো মনে আছে, রামায়ণের একটা দৃশ্য ছিল, মারীচ তির খেয়ে পড়ে আছে, শ্রীরাম তার পাশে, হাতে তির-ধনুক। কী জোরদার ছবি। আচ্ছা, জানি না আপনি এটা বলতে পারবেন কি না, আপনি তো ফিজিসিস্ট বায়োলজিস্ট নন। রামায়ণ-মহাভারতে অনেক রাক্ষস খোক্কসের কথা আছে, যারা রূপ বদলাতে পারে। যেমন শূর্পনখা, মরীচ। এটা কী করে সম্ভব?

প্রজ্ঞা : শূর্পনখা তো জাস্ট মেকআপ।

আদিত্য : মেকআপ দিয়ে কি একটা রাক্কুসী-মার্কা মেয়েকে বিরাট সুন্দরী বানিয়ে দেওয়া যায়? বিশ্বাস হয় না।

তীর্থঙ্কর : হয়, হয়। এ ব্যাপারে আমারই একটা অভিজ্ঞতা আছে।

প্রজ্ঞা : শূর্পনখার অভিজ্ঞতা? সেটা কীরকম, বলো।

তীর্থঙ্কর : তখন আমি ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছি। একটা ফান্ড রেইজিং ডিনারে আলাপ হয়েছিল হলিউডের তখনকার এক নামি অভিনেত্রীর সঙ্গে। নামটা বলছি না, নিশ্চয়ই চিনে ফেলবেন। ওনাকে আগে সিনেমার পর্দায় দেখেছি। কী দুর্দান্ত অভিনয়, আর তেমনি অপূর্ব সুন্দরী। কী চোখ, কী ভুরু, কী চুল, কী গ্ল্যামার। কী মিষ্টি হাসি।

ডিনারের সময় কথায় কথায় সেটা বলে ফেলেছিলাম ওনাকে। দু'সপ্তাহ পরে উনি আমাকে ফোন করলেন, সপ্তাহ শেষের সন্ধ্যেয় একটা রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলেন। অবাক লেগেছিল। ভালোও লেগেছিল, স্বপ্নের সুন্দরীর সঙ্গে সন্ধ্যে কাটানো। তা, সন্ধ্যেটা ভালোই কাটলো। চিজ, শ্যাম্পেন আর মাছ-ভাতের মেক্সিকান পদ, জাম্বলায়া। একটু নেশাও হয়েছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা গেলাম ওঁর বাড়ি। বেভারলি হিলসে প্রাসাদের মতো বাড়ি। নিজেই চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। এরকম বাড়িতে একজন পরিচারিকা থাকার কথা, বোধহয় সে ছুটি নিয়েছে। আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে উনি গেলেন ভেতরে, কফি বানাতে। মাথাটা একটু ঘুরছিল, বোধহয় বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলেছি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল, উনি কী করছেন এতক্ষণ? গুটি গুটি এগোলাম অন্দরমহলের দিকে । একটা দরজা আধখোলা ছিল, পাল্লায় চাপ দিতেই খুলে গেল। ঘরের মধ্যে বিশাল আয়না, সেই আয়নায় ওঁর প্রতিচ্ছবি দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর দ্রুতপায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা দূরেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর কখনো ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

বাঁকের মুখ ঘুরতেই দেখা গেল, উলটোদিক থেকে একটা দৈত্যাকার ট্রাক প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে। তীর্থঙ্কর চুপ করল। শক্ত হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং সামলালো আদিত্য, গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁদিকে ঘেঁষে নিল। ট্রাকটা চলে গেল, বাতাসের ধাক্কায় ওদের গাড়িটা নড়ে উঠল। সামনে এখন আবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। গাড়ির কাচে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই কোথাও। একটু পরে আদিত্য বলল, ''সেদিন কী দেখেছিলে, বললে না তো?''

তীর্থঙ্কর : কোন দিন?

আদিত্য : সেই হলিউড হিরোইনের বাড়িতে।

তীর্থঙ্কর : হ্যাঁ। একটা সুন্দর পেইন্টিংকে গুন্ডার তুলির খোঁচায় কুশ্রী হয়ে যেতে দেখলে যেরকম লাগে, সেরকমই সেদিন লেগেছিল। ওনার চুল নকল, ভুরু নকল, দাঁত নকল, সেই উজ্জ্বল নীল চোখের মণিও আসলে কন্ট্যাক্ট লেন্স। দেখলাম, সেই নকল জিনিসগুলো ছাড়া পুরো মুখটাই কেমন যেন বদলে গেছে। কুৎসিত, বীভৎস হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাসলো অর্ক। তারপর বলল, ''তারপর নিশ্চয়ই সেই হিরোইনের সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন?''

তীর্থঙ্কর : মনে হয়েছিল তাই করি। পরে ভেবে দেখলাম, আমার ভালো লাগে ওনার অভিনয়। এই মেকআপ, সেটাতো অভিনয়েরই অঙ্গ। অভিনয়টাও তো নকলই, তাই না? তাছাড়া, আমি তো—হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ দেখা গেল, একটা ছায়ার মতো কিছু জঙ্গল থেকে লাফিয়ে রাস্তার ওপর এসে পড়ল। স্ক্রিইইইইইচ শব্দ, প্রাণপণে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করল আদিত্য, কিন্তু ততক্ষণে বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। সেই ছায়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ির সামনে। একটা জান্তব আর্তচিৎকার, উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে থেঁতলে ছিটকে পড়ল একরাশ রক্ত আর মেদ-মজ্জা। তারপরই গাড়ির চাকার নীচে মড়মড় শব্দ। ডাবল-ইন্ডিকেটর দিয়ে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করালো আদিত্য, আতঙ্কে হাত পা কাঁপছে। গাড়ির ভেতর সবারই ঘুম ভেঙে গেছে ততক্ষণে।

''কী হলো?'' ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনন্দ।

''গাড়ি কিছু একটাতে ধাক্কা মেরেছে। আমি দেখছি। একটা টর্চ হবে কারোর কাছে?'' প্রজ্ঞা বলল।

''ওই তো, গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট...দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে আসছি।'' বলল তীর্থঙ্কর।

গাড়ি থেকে নেমে দুজনে এগিয়ে গেল রাস্তা ধরে পেছন দিকে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, দূরে রাস্তার ধারে ঢিপির মতো উঁচু একতাল মাংসপিণ্ড পড়ে আছে। কাছে গিয়ে টিপিটার ওপর টর্চ ফেলল তীর্থঙ্কর।

—ক্যাঙ্গারু।

প্রজ্ঞা : রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিল। নিশ্চয়ই হেডলাইটের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে.... ওহ্, কী বীভৎস।

তীর্থঙ্কর : আর কিছু করার নেই আমাদের। এখানে রাস্তার ওপর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, বড়ো বড়ো গাড়ি যাতায়াত করছে। চলুন।

প্রজ্ঞা : ঠিক আছে, চলো।

দুজনে গাড়িতে ফিরে এল। এবার স্টিয়ারিঙে বসলেন প্রজ্ঞা।

আরও আধ ঘণ্টা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটানা গাড়ি চালানোর পর একটা ব্রিজ পার হতেই রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, ক্যান রিভার ভ্যালি। তীর্থঙ্কর বলল, ''জানো তো, মাত্র হাজারখানেক জনসংখ্যা এই জায়গাটার। মাছ ধরা এই শহরের লোকেদের পেশা আর নেশাও। লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে, মৎস্য মারিব খাইব সুখে, এটাই এ শহরের বাসিন্দাদের মূলমন্ত্র।''

''হাউ ডিড য়ু নো?'' নিকোল বলল।

''আমার অফিসের একজন এদিকে মাঝেমাধ্যেই বেড়াতে আসে। ওর কাছেই শুনেছি। সেই লোকটারও মাছ ধরা নিয়ে

পাগলামি আছে।''

পাঁচশো মিটার দুরেই চোখে পড়ল একটা মোটেল। গাড়ি ঢোকালেন প্রজ্ঞা। প্যাসেজওয়ের ধার ধরে সারি সারি অনেকগুলো ঘর।

''এ কী? আমাদের তো জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকার কথা। মোটেলে ঢুকছি কেন?'' গিনির গলায় স্পষ্ট হতাশা।

''ক্যাম্পিং তো কাল থেকে। আজ এত রাতে নতুন জঙ্গলে ঢোকা ঠিক নয়।'' বললেন প্রজ্ঞা।

ভাগ্য ভালো, পুরো মোটেলটাই বোধহয় ফাঁকা। সাতটা ঘর এক রাতের জন্য বুক হয়ে গেল চটপট। সবাই ফ্রেশ হয়ে এসে তীর্থঙ্করের ঘরে জমায়েত হলো। দেখল, মদালসা ততক্ষণে সেখানে জমিয়ে বসেছেন।

আজকাল ভারত দেশটা কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে,'' বলছিলেন মদালসা, ''আগে কত ভালো ছিল। মনে আছে, 'আমন কী আশা' বলে একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হতো, তার মাধ্যমে আমি অনেকবার পাকিস্তান গিয়েছি। কত ভালো, কী অতিথি পরায়ণ ওখানকার লোকেরা। লাহোরের সেই কাবাবের দোকান... আহাহা! তার ওপর অনেক উপহার পেতাম। আর এই আজকের ভারত সরকার, সেকুলারিজম ত্যাগ করে পাকিস্তানের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে সেই 'আমন কী আশা' একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আমি কিছুতেই এইসব গোঁড়ামো মেনে নিতে পারি না। ইসলাম একটা মহান ধর্ম। আরবরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবে ছিল, ইসলাম তার থেকে আরবদের মুক্তি দিয়েছিল। পবিত্র আরব ভূমিতে...''

আদিত্য : আরবের কথা যখন তুললেন, তখন বলি, আপনি কি সৌদি সম্বন্ধে একটা খবর শুনেছেন?

মদালসা : কী খবর?

আদিত্য : ইসলাম পূর্ববর্তী আরবের অধিবাসীরা বহু দেবদেবীর পূজা করত। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন তিন দেবী। আজকাল এই তিন দেবীর সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সৌদি আরবের লোকেরা।

প্রজ্ঞা : হ্যাঁ, আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম, এই তিন দেবীর নাম আল্-লাত, আল-হুজ্জা, মান্নাত। ইসলামের সমর্থকরা যখন কাবায় আক্রমণ করে সেখানকার সব দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করতে শুরু করেছিল, তখন সেখানকার পুরোহিতরা এই তিন দেবীর মূর্তি জাহাজে করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। সেই মূর্তি তিনটি আশ্রয় পায় গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে। অনেকে বলে, সেই তিন মূর্তির খোঁজেই নাকি ইসলামের অনুসারীরা বারবার সোমনাথ আক্রমণ করেছিল।

মদালসা : কিন্তু সে মূর্তি তো কেউ খুঁজে পায়নি, তাই না?

প্রজ্ঞা : না, পায়নি। কিন্তু কল্পনা করুন, আজ যদি কেউ সোমনাথের সমুদ্রের বালি খুঁড়ে সেই তিন দেবীর মূর্তি খুঁজে পায়, তখন কী হবে?

আদিত্য : আমার মনে হয়, আরবরা বিরাট একটা মন্দির বানিয়ে সেখানে এই তিন দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবে। ঘটা করে নিত্যপূজা করবে। তাই না? সেটা পৃথিবীর সেকুলারিজমের পক্ষেও একটা ভালো ব্যাপার হবে।

প্রজ্ঞা : তবে সে ঘটনার প্রভাব ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে কীরকম পড়বে, সেটাই ভাববার বিষয়। যারা আরবের অনুসারী হয়ে একেশ্বরের দোহাই দিয়ে দেশভাগ করল, তারা যখন দেখবে, খোদ আরবের লোকেরা....

‘‘কক্ষনো না,’’ রেগে ওঠেন মদালসা, ‘‘এসব ভুলভাল কথা বলে...’’

দরজার বাইরে গুমগুম শব্দে চমকে উঠল সবাই। তার ঠিক পরেই দজায় রূঢ় করাঘাতের আওয়াজ। তীর্থঙ্কর সোফা ছেড়ে তড়াক করে উঠে দরজা খুলে দেখে, দশ-বারোটা বিশাল সাইজের মোটরবাইক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আর দাঁড়িয়ে দশ-বারোজন লোক, পরনে তাদের কালো চামড়ার তৈরি বাইক-আরোহীর পোশাক। একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল সবার মেরুদণ্ড বেয়ে। বাইকি গ্যাং! এই ধরনের অনেক বাইকি গ্যাং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম করে। সাধারণ মানুষ এদের এড়িয়েই চলে, কারণ এদের সঙ্গে ঝগড়া লাগলে এরা মুহূর্তে মারপিট খুনজখমে নেমে আসে।

‘‘ইজ দিস ইয়োর কার?’’ ওদের গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলল একজন বাইক-আরোহী। আরোহীর গলাটা মেয়েদের মতো, হেলমেটে মুখ ঢাকা।

‘‘ইয়েস। এনি প্রব্লেম?’’ বলল তীর্থঙ্কর।

‘‘ব্লাডি হেল ইয়েস! ইউ হ্যাভ পার্কড ইন আওয়ার স্পট।’’

নজরে পড়ল, গাড়িটা সত্যিই ভুল জায়গায় পার্ক করা আছে। মোটেলের প্রত্যেকটা ঘরের সামনেই একটা করে পার্কিং স্পেস আছে। ওরা যখন এসেছিল, তখন তো জানা ছিল না, কোথায় ঘর দেবে। ঘর বরাদ্দ হওয়ার পর গাড়িটা সরিয়ে ওদের ঘরগুলোর কোনো একটার সামনে এনে রাখা উচিত ছিল। তাড়াহুড়োতে, ক্লান্তিতে সেটা করতে ভুল হয়ে গেছে।

—আই অ্যাম ভেরি সরি।

—ওয়েল, ইউ শুড বি।

ভারী অভদ্র লোকগুলো। আদিত্য গম্ভীর মুখে চাবি নিয়ে এসে গাড়িটা সরিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে এসে বসল। সবারই চোখে মুখে আতঙ্ক।

আত্রেয়ী : কী হবে এখন? আমি তো শুনেছি এই সব বাইকিরা স্বভাব অপরাধী হয়। মাঝরাতে আমাদের আক্রমণ করবে না তো?

আদিত্য : গাড়িতে একটা লাঠি আছে, ওটা ঘরে এনে রাখি। অ্যাই গিনি, রেশমি, বিবু—তোরা খবরদার বাইরে বেরোবি না।

প্রজ্ঞা : আমার মনে হয় এই মুহূর্তে এতটা ভয় পাওয়ার দরকার নেই। এদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লেই হলো।

ইন্দ্রাণী : একটা ব্যাপার আমার খুব অবাক লাগছে। বাইকি গ্যাঙে মেয়েরা থাকে, এটা কখনো শুনিনি। যে বাইকিটা ঝগড়া করছিল, সে তো মনে হলো মেয়ে।

সেদিন রাতের মতো সবাই ঘুমোতে গেল, অস্বস্তি আর ভয় নিয়ে।

ভোর থাকতেই সবাই উঠে পড়েছে, তৈরি হওয়ার তোড়জোড় চলছে। সামনে লম্বা একটা দিন, অনেক পরিকল্পনা। আদিত্য সকাল থেকেই হাঁকডাক লাগিয়ে দিয়েছে, ‘‘সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। দেরি হলে মুশকিল হয়ে যাবে। অর্ক, তোর হলো? এত সময় লাগাচ্ছিস কেন? ডোবাবি মনে হচ্ছে। আরে, আত্রেয়ী গেল কোথায়?’’

সত্যিই তো, আত্রেয়ীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কী হলো? রেশমী দরজা খুলে দেখতে যাবে, তীর্থঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাই, বেরোস না বাইরে। সেই বাইকিগুলো আছে।’’

দরজার ফাঁকে চোখ রেখে রেশমী বলল, ‘‘দেয়ার ইজ আত্রেয়ী অ্যান্টি, টকিং টু দ্য বাইকিজ।’’

জানলার পর্দা সরিয়ে আদিত্য অবাক হয়ে দেখে, সত্যিই

বাইরে একগাদা বাইকি পরিবেষ্টিত হয়ে আত্রেয়ী হাহা করে হাসছে, যেন ওরা আত্রেয়ীর কতকালের পুরোনো ইয়ার দোস্ত। আরে, আশ্চর্য। গতকাল রাতের অন্ধকারে বোঝা যায়নি, এখন দিনের আলোতে, বিশেষ করে যখন এই বাইকিরা হেলমেট পরেনি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বাইকিদের মধ্যে অর্ধেকই মহিলা। বয়স্ক মহিলা। এ কেমনধারা বাইকি গ্যাং?

''আত্রেয়ীটার না, কোনও সেন্স নেই। এত দুঃসাহস ভালো না। পইপই করে বললাম কাল রাতে, এদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। আর উনি গেছেন ওই গুন্ডাদের সঙ্গে ভাব করতে। পারা যায় না আর।'' গজগজ করতে লাগল আদিত্য। এমন সময় আত্রেয়ী ঘরে ঢুকল।

''আন্টি, হাউ ব্রেভ অফ ইউ।'' রেশমী বলল।

''হ্যাঁ, আত্রেয়ী কাকিমা, কী সাহস তোমার, ওই গুন্ডাগুলোর সঙ্গে গিয়ে ভাব করেছো।'' গিনি বলল।

''আরে, ওরা কেউ গুন্ডা নয়।'' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল আত্রেয়ী।

''গুন্ডা নয়—মানে?'' অবাক গিনি।

—বাইক চালায় মানেই কি গুন্ডা? এরা সবাই চাকরিবাকরি করে, ফ্যামিলি-পার্সন। নিউকাসলে থাকে, একই পাড়ায়, প্রতিবেশী। ছেলে-মেয়েরা সব বড়ো আর স্বাবলম্বী হয়ে গেছে, তাই এরা চাকরি থেকে দুমাসের ছুটি নিয়ে বাইক চড়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছে।

—মানে, এরা কেউ গুন্ডা নয়?

—না। এরা সবাই আমাদের মতোই বেড়াতে বেরিয়েছে। সব গুন্ডাই যেমন বাইকি নয়, তেমনি সব বাইকিই নিশ্চয়ই গুন্ডা নয়। কি, তোমরা রেডি হলে? সাতটা তো বেজে গেল।

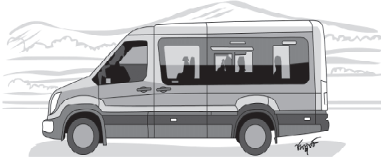

ক্যান রিভার ভ্যালি থেকে ম্যালাকুটা যাওয়ার পথটা খুব সুন্দর। দুধারে অনতিউচ্চ পাহাড়, সে পাহাড়ের ওপর সারি সারি লম্বা গাছ সুশৃঙ্খল ছন্দে দাঁড়িয়ে আছে, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে। আকাশটাকে আড়াল করতে পারেনি, পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পাথর কেটে আঁকাবাঁকা যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা যথেষ্ট চওড়া। ১০০ কিলোমিটার বেগে ম্যালাকুটা পৌঁছোতে এক ঘণ্টার বেশি লাগল না। শহরটা উঁচু জায়গায়, সেখান থেকে ঢালু রাস্তা নেমে গেছে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। অনেক ক্যারাভ্যান দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের পাড়ে। কাঠের লগ দিয়ে বাঁধানো শান্ত সমুদ্রের পাড়, সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে অনেকে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। বেশ কয়েকটা কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি রয়েছে এদিক-ওদিক, তারই একটা দখল করে বসল ওরা। সকালের সমুদ্রের তাজা হাওয়া যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রাণী আর আত্রেয়ী একটু আলাদা হয়ে বসেছে, সমুদ্রের ধারে পা ঝুলিয়ে।

ইন্দ্রাণী : কী অপূর্ব জায়গা, তাই না?

আত্রেয়ী : হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ক্রোয়াজিঙ্গলং যাওয়ার দরকার নেই, এখানেই থেকে যাই।

ইন্দ্রাণী : আমরা কিন্তু ক্রোয়াজিঙ্গলংয়ের মধ্যেই আছি।

আত্রেয়ী : আচ্ছা? এটাও কি ক্রোয়াজিঙ্গলং?

ইন্দ্রাণী : আমি যতদূর জানি, লেকস এন্ট্রান্সের একটু পর থেকেই শুরু হয়েছে ক্রোয়াজিঙ্গলং, চলেছে নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমান্ত পর্যন্ত।

আত্রেয়ী : কিন্তু এখানে তো জঙ্গল নেই?

ইন্দ্রাণী : হ্যাঁ, যেমন ক্যান রিভার ভ্যালিতেও জঙ্গল নেই। কিন্তু এই সব জায়গাগুলো হচ্ছে একেকটা পকেট, এর বাইরে শুধুই থই থই অনন্ত জঙ্গল।

আত্রেয়ী : তাহলে এখানেই থেকে যাওয়া যাক?

ইন্দ্রাণী : আজ সকালে মনে হচ্ছিল, ক্যান রিভার ভ্যালিতেই থেকে যাই।

আত্রেয়ী : যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই মনে হচ্ছে থেকে যাই। পরশু মনে হচ্ছিল আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, লেকস এন্ট্রান্সেই ডেরা বাঁধি।

ইন্দ্রাণী : আরে, বিবু কোথায় গেল?

অত্রেয়ী : মেয়েটা যে কোথায় চলে যায় মাঝে মাঝে।

এমন সময় হইচই করে এসে পড়ল গিনি আর বিবু, টাটকা মাছের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে। বিবুর হাতে ঝুলছে বিশাল দুহাত লম্বা তিনটে মাছ, চকচকে রুপোলি রং সেগুলোর।

ইন্দ্রাণী : কোথায় পেলি মাছগুলো?

বিবু : ওই তো, ওই লোকটা.....ওই তো সামনে.... মাছ ধরছে, ওর কাছ থেকেই কিনে আনলাম।

ইন্দ্রাণী : কী করবি এখন মাছগুলো দিয়ে?

বিবু : কেন? খাব।

ইন্দ্রাণী : কাঁচা কাঁচা মাছ খাবি? পেতনি হলি নাকি?

আত্রেয়ী : ধ্যাৎ! ওই তো ওখানে পাবলিকের ব্যবহারের জন্য বারবিকিউ আছে, ওটাতে মাছ ঝলসাবো।

ইন্দ্রাণী : কাটতে হবে না মাছটা?

আত্রেয়ী : এই তো ওখানে মাছ কাটার, ধোয়ার সব ব্যবস্থা আছে। আর ছুরি—

ইন্দ্রাণী : নুন মশলা মাখাতে হবে না মাছে? সঙ্গে কী খাবি? স্যালাড, রুটি এসব লাগবে তো?

আত্রেয়ী : ছেলেগুলো আছে কী করতে? ওদের পাঠিয়ে

দে। আসার পথেই তো দেখলাম ওইদিকে একটা ফুডওয়ার্কসের দোকান আছে। ওখান থেকে সব কিনে নিয়ে আসবে।

হাঁক শুনে এগিয়ে এল অর্ক। ''ঠিক আছে, আমি এখনি নিয়ে আসছি।''

অর্ক আর আদিত্য মিলে দোকান থেকে সব জিনিস কিনে আনলো, বাকিরা ততক্ষণে মাছগুলো কেটে পরিষ্কার করে ফেলেছে। মাছের টুকরোগুলোতে মশলা মাখানো হলো। বারবিকিউয়ের গরম তাওয়ায় ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ আওয়াজ উঠল, দেখতে দেখতে বাতাসের লোনা গন্ধর সঙ্গে ভাজা মাছ আর মশলার মিষ্টি গন্ধ মিশে গেল। জমিয়ে ভোজ হলো, কিন্তু আড্ডা জমলো না, জিপসি পয়েন্ট পৌঁছোতে হবে তাড়াতাড়ি। দেড়টার মধ্যে না পৌঁছোলে আসল জিনিসটাই বাদ পড়ে যাবে।

জিপসি পয়েন্ট ওরা পৌঁছোলো, তখন দুপুর একটা। চারিদিকে জঙ্গলের মাঝে কয়েকটা জলা, সমুদ্রের খাঁড়ির অংশ। অনেক পাখি দেখা যায় এখানে। সপ্তাহে তিনদিন একটা স্টিমার ছাড়ে এখান থেকে, দেড়টা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত এই জলা থেকে ওই জলা সব ঘুরে দেখায়। মজার জায়গা এই জিপসি পয়েন্ট। ছোট্ট একটা গ্রাম, মানুষ, পাখি, গিরগিটি, পতঙ্গ, গাছপালা সব নিয়েই যেন একটা পরিবার। চারিদিকে শান্তি, কোনো তাড়া নেই কারোর। মাত্র কয়েকটি পরিবারের বাস এখানে, তারমধ্যে একজন এখানকার জনজাতি বয়োজ্যেষ্ঠ। জিপসি পয়েন্টের আদিম ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাতে ওঁর নাকি অসামান্য অবদান রয়েছে। ওঁর বাড়ির সামনেই একটা ঝুড়িতে করে একরাশ কাগজি লেবু রাখা ছিল। ইন্দ্রাণী গিয়ে একটা তুলে নিল।

''ফ্রি দিচ্ছে নাকি?'' আত্রেয়ী বলল।

পাশে একটা বোর্ডে লেখা আছে—যত খুশি লেবু নিয়ে যান, আর দয়া করে টাকা পয়সা রেখে যাবেন না।

''অবাক কাণ্ড, তাই না?'' ইন্দ্রাণী বলল।

লেকের ধার ধরে পার্কিং লট, সেখানে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে তাদের মোটরচালিত নৌকো বাঁধা। পার্কিং ঘুরে বাঁধানো চওড়া রাস্তাটা ঢালু হয়ে জলের মধ্যে চলে গেছে। কোনো সিঁড়ি, কোনো ধাপ নেই? এরকমটা কেন? কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল। এক ভদ্রলোক গাড়িটাকে পার্কিং থেকে বার করে ঠিক সেই ঢালু জায়গাতে নিয়ে গেলেন। তারপর গাড়িটাকে ব্যাক গিয়ারে চালিয়ে সেই ঢালু রাস্তা দিয়ে নামিয়ে দিলেন। গাড়ির পেছনে বাঁধা নৌকোটা ধীরে ধীরে জলে ভেসে পড়ল। ঠিক এই সময় এক ভদ্রমহিলা, বোধহয় সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীই হবেন, হাঁটুজলে নেমে গাড়ি আর নৌকোর মাঝের বাঁধনটা খুলে দিলেন। ভদ্রলোক গাড়িটা পার্কিঙে রেখে এলেন, তারপর দুজনেই নৌকোয় চড়ে উধাও হলেন।

স্টিমারের ভোঁ পড়ল, সবাই হইচই করে উঠে পড়ল স্টিমারে। ওরা ছাড়াও আরও দু-তিনটে পরিবার উঠেছে। ডাঙা ছেড়ে স্টিমার গুটি গুটি জলের দিকে এগোলো। আলাপ হলো স্টিমার চালকের সঙ্গে। নাম জন, ছোটোবেলা থেকে এই জল-জঙ্গলেই মানুষ। কোন পাখি কোথায় থাকে, কোথায় বাসা বেঁধেছে, কোথায় ডিম পেড়েছে, সব ওর নখদর্পণে। স্টিমারের যাত্রাপথে জল থেকে কয়েকটা ভাসমান প্লাস্টিকের বোতল তুলে নিয়ে ফেলে দিল স্টিমারের ডাস্টবিনে। জল পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ও নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছে। জানা গেল, ওর স্টিমারের জ্বালানি হলো ইউক্যালিপটাসের তেল।

—সারাক্ষণ যেন ঘন্টি বাজছে, তাই না? ইন্দ্রাণী বলল।

—এটা একজাতের পাখির ডাক। পাখিটার নাম বেলবার্ড। বিবু বলল।

—তাই নাকি? তুই কী করে জানলি?

—ড্যান্ডিনং রেঞ্জেও এই পাখিটা দেখেছি। ওই দেখো, ওই ডালটাতে বসে আছে।

দেখা গেল একটা ছোট্ট পাখি, ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। গাঢ় নীল রং, উজ্জ্বল কমলা রঙের লেজ।

স্টিমার জলার যত গভীরে যাচ্ছে, জলের ধারের গাছগুলো তত লম্বা হচ্ছে। কী বিশাল গাছগুলো! মগডালের দিকে তাকালে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। গাছের শিকড় নেমে এসেছে জল পর্যন্ত, ছায়া ছায়া অন্ধকার তৈরি করেছে জলের ধার ধরে। কত নাম-না-জানা পতঙ্গ আর মাছের বাস সেখানে। এক জায়গায় দেখা গেল, এক বাবা আর ছেলে ডিঙ্গিনৌকো নিয়ে মাছ ধরছে। স্টিমার দেখে ওরা বিরক্তই হলো, জলের নাড়াচাড়ায় মাছ পালিয়ে যাবে। একটা জায়গায় এসে স্টিমার থামলো। জানা গেল, এখানে গাছের মগডালে গত কুড়িবছর ধরে একটা ঈগল পরিবারের বাস। সাদা ঈগল।

—ওদের দেখা যাবে? আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল।

—ব্যবস্থা করছি, জন বলল।

—কী করে?

—এক্ষুনি দেখবেন?

স্টিমারের ভাঁড়ার খুলে জন একটা বালতি বার করল। অনেক মাছ আছে সেই বালতিতে। সেখান থেকে একটা মাছ বার করে ছুঁড়ে দিল জলে। চকিতে দুরের উঁচু গাছের মগডালে একটা সাদা ছায়া নড়ে উঠল। সবার বিস্মিত চোখের সামনে সেই ছায়াটা তিরবেগে নেমে এল নৌকোর দিকে। তিন মিটার দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ল ছায়াটা, তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর শরীরের সাদা পালকগুলো, ডানার কালো দাগগুলো। ইন্দ্রাণীর ক্যামেরায় মুহুর্মুহু ক্লিক ক্লিক আওয়াজের মধ্যে রাজসিক ভঙ্গিতে ঈগলটা ঝাঁপ দিল জলে, ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মাছটাকে। মুহূর্তের মধ্যে আবার ঈগলটা আসীন হলো গাছের মগডালে। তখন বোঝা গেল, আগে কেন ঈগলটাকে দেখা যায়নি।

আশেপাশের লম্বা গাছগুলোর কাণ্ডের প্রায় একই রং, সাদা আর কালো। তার সঙ্গে মিশে থাকে ঈগলের দেহটা, না নড়লে বোঝা যায় না ওটা একটা জীবন্ত প্রাণী। এরকম করে জায়গায় জায়গায় স্টিমার থামানো হলো, পাখিদের খাওয়ানো হলো। সেই করতে গিয়ে নানান জাতের মাছরাঙ্গা, যাদের এখানে কুকাবারা বলে, তাদের দেখা মিলল।

সরু খালের মাঝখান দিয়ে চলেছে স্টিমার। খালের দুই পাড়ে ঘন শ্যামলের ছাউনি। ফাঁকফোকর দিয়ে লুকোচুরি খেলছে সোনালি আর গেরুয়া আলো। সবুজ জলের শরীরে আবছায়া অন্ধকার। মাথার কাছে ইন্দ্রলুপ্তের মতো গাছের ঘোমটার ফাঁকে, সেখান দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সড়াৎ সড়াৎ শব্দ করে কীসব যেন ডাঙ্গা থেকে জলে নেমে এল। কিরিকিরি শব্দে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। নৌকো এগিয়ে চলেছে। পাকানো দড়ির মতো গাছের কাণ্ড ছড়িয়ে আছে মাটির বুক জুড়ে। গাছ থেকে ঝুলছে গোল ত্রিভুজ পঞ্চভুজ নানান আকৃতির পাতা।

স্টিমারের সামনের দিকে বসে আছে এক দম্পতি। এক প্রৌঢ় ককেশীয়, সঙ্গে এক যুবতী, সম্ভবত পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশের। আশেপাশের এত অবাক করা দৃশ্য, তার দিকে মন নেই ওদের। দুজনে দুজনকে ক্রমাগত আদর করে চলেছে। যদি এটাকে আদর বলা যায়। ওদের আদরের মধ্যে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু জান্তব ক্ষুধা।

ইন্দ্রাণী : কী অসভ্য রে বাবা!

আত্রেয়ী : হ্যাঁ। এসব করতে হয়, হোটেলের ঘরের দরজা বন্ধ করে করলেই পারিস। এরকম খোলা জায়গায়, বাচ্চাগুলোর সামনে, মাগো!

আদিত্য : তুমি কথাগুলো বলছ ঠিক ঠানদিদি-মার্কা। এদেশে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

মদালসা : সত্যি, কী অসভ্য। কী বন্য!

আদিত্য : আপনার বন্য শরীরের হাহাকারের একটা পার্ট টু লেখা যায় এদের নিয়ে, কী বলেন?

মদালসা রেগে গেলেন, ‘‘যে জিনিসটা বোঝো না, সেটা নিয়ে কথা বোলো না।’’

‘‘বিলাবং!’’ চিৎকার করে উঠল গিনি। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল গাছ ছেড়ে।

‘‘শশশশশ!’’ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করল রেশমী।

মদালসা : ‘‘বিলাবং’’ মানে?

ইন্দ্রাণী : বিলাবং মানে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।

মদালসা : ও! এই ‘বিলাবং’ কথাটা কোন ভাষার? অস্ট্রেলিয়ান?

ইন্দ্রাণী : অস্ট্রেলিয়ান বলে কোনো ভাষা নেই মাসিমা।

মদালসা : তাহলে এটা কোন ভাষা?

ইন্দ্রাণী : বিলাবং শব্দটা সম্ভবত উইরাদজুরি উপজাতির যে ভাষা, তার শব্দ। অস্ট্রেলিয়ার সব উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা আছে।

বাঁক ঘুরতে খালের শেষ দেখা গেল। জঙ্গল হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। সেখানে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। পাড়ের কাছটা ঢাকা পড়ে আছে অসংখ্য ঊর্ধ্বমুখী শিকড়ে, সাদা ফলা তাদের বর্শার ফলার মতোই ধারালো। তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘাসজমি শুরু হয়েছে, অনেক গোরু চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। দিগন্ত বিস্তৃত সেই প্রান্তরের মাঝে বেমানান একটা বিশাল ঝাঁকড়া গাছ। প্রকাণ্ড এক ফোকর সেই গাছের গায়ে। ঠিক যেন এক আদিম পিশাচ, হ্যাঁ করে গিলতে আসছে। গাছের ঠিক পাশে উঁচু এক কাঠের খাম্বা। তাতে খোদাই করা ঈগল, গিরগিটি, আরও কত কী। কালো কাঠের খাম্বা, সূর্যের অস্তগামী আলোয় অপার্থিব এক রং ধরেছে। খাম্বার ওপর আশীর্বাদের কমলা রঙের আলো ঢেলে দিনমণি অস্ত যাচ্ছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। সন্ধ্যে নামছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের আদিম অরণ্যে। আশেপাশের সবুজ রংটা এখানে এসে বদলে গেছে। আগে চারিদিকেই ছিল ঘন কালচে সবুজের রাজত্ব, এখন আশেপাশে কচি কলাপাতার রং। দূরে একদল গোরু ঘাস খাচ্ছে, বিশাল তাদের আকৃতি। দেশের গোরুর থেকে অনেক বড়ো। এখান থেকে স্টিমারের মুখ ঘোরালো জন, ফেরার রাস্তায়। সোনালি চুল একটা বয়ঃসন্ধির মেয়ে এসে কফি আর বিস্কুট বার করে টেবিলে গুছিয়ে রাখল। সবাই হাতে কফি তুলে নিল।

—থ্যাঙ্ক ইউ। খুব মিষ্টি মেয়ে তুমি। নাম কী তোমার? ইন্দ্রাণী বলল।

—ডেল্টা।

—সুন্দর নাম।

জনের মুখেচোখে গর্ব, বলল,

—আমার মেয়ে। এখন কলেজের ছুটি চলছে তো, তাই আমার কাজে সাহায্য করছে। তাছাড়া, ওরও এই জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। যেমন আমার ছোটোবেলায় লাগতো।

—তার মানে ও আপনার শিক্ষানবিশ বলুন?

—তা বলতে পারেন।

—খুব ভালো লাগল জন, তোমার আর তোমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে। এটা দেখে আরও ভালো লাগল, এই জল-জঙ্গলের সম্বন্ধে তোমার যে অগাধ জ্ঞান, সেটা তোমার মেয়ে তোমার কাছ থেকে শিখছে।

বিবুর সঙ্গে এর মধ্যেই ডেল্টার ভাব হয়ে গেছে। দুজনে স্টিমারের সামনের পাটাতনে গিয়ে বসেছে, পা ঝুলিয়ে। সূর্য ঢলছে, হলুদ থেকে কমলা হচ্ছে। শীত শীত করছে। জিপসি পয়েন্টে যখন স্টিমার ফিরে এল, সবারই তখন মন খারাপ। এতক্ষণ সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, সেই নেশাটা

ভেঙে গেল, স্টিমার যখন বন্দর স্পর্শ করল।

সুন্দরী ম্যালাকুটার সঙ্গে কাটানো একটা সুন্দর দিন পেছনে পড়ে রইল। সেই সুন্দর পাহাড়ি রাস্তাটা ধরে এবার ক্যান রিভার ভ্যালি ফিরে চলা। ক্যান নদীর ওপর ব্রিজটা যেখানে আছে, তার আগেই একটা রাস্তা বাঁদিকে ঘুরেছে, গেছে জঙ্গলের দিকে। চওড়া কংক্রিটের রাস্তাটা ১৭ কিলোমিটার পরেই ফুরিয়ে গেল, শুরু হলো সরু এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা। কিছুদূর যেতেই জিপিএসও ধোঁকা দিল। অবশ্য এই জঙ্গলে একটাই রাস্তা, জিপিএস ছাড়াও চিনতে অসুবিধা হয় না। ভীষণ বাজে সেই রাস্তা, গাড়ি লাফাচ্ছে ক্রমাগত। বাচ্চারা মজা পাচ্ছে, কিন্তু বাকিদের অবস্থা শোচনীয়। বিশেষত মদালসার। বয়স্ক মানুষ, তার ওপর এরকম অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই। গাড়ি একেকবার লাফিয়ে উঠছে, উনি উহুহু করে উঠছেন। ঘন জঙ্গল দুপাশে। এ জঙ্গলের জাতই আলাদা। সাধারণত জঙ্গলের দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে পেছনে কী আছে দেখা যায়। এখানে তার জায়গায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দুটো গাছের মাঝে ফাঁক এত কম, যে একটা খরগোশও গলে যেতে পারে কিনা সন্দেহ। ২৮ কিলোমিটার পাথুরে রাস্তার পর সামনে পড়ল একটা সরু ব্রিজ, তার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণকায়া থুরা নদী। কয়েকটা বেড়াতে আসা পরিবার আশেপাশে তাঁবু খাটিয়ে সংসার পেতেছে নদীটাকে কেন্দ্র করে। সরু নদীটা কিছুক্ষণ পরেই গিয়ে মিশেছে কুমেরু মহাসগরে।

—বিশ্বাসই করতে পারছি না, এই সেই ক্রোয়াজিঙ্গলং। কতদিন ধরে ইচ্ছে ছিল, এখানে আসব।

ছোটোবেলায় কপালকুণ্ডলা পড়েছিলাম। সেই ঘন জঙ্গল আর সমুদ্র, সেটাও বুঝি এরকমই ছিল, তাই না? আত্রেয়ী বলল।

অর্ক আর তীর্থঙ্কর ধরাধরি করে গাড়ির মাথা থেকে নৌকো নামালো, জলে ভাসানো হলো।

—মাছ পাবে তো? রাত্রে কিন্তু তোমাদের ধরা মাছ দিয়েই ডিনার হবে। ইন্দ্রাণী বলল।

—চিন্তা করো না, অনেক মাছ আছে এই নদীতে। তীর্থঙ্কর বলল।

—ইন্দ্রাণী, জানো তো, মাছ ধরার মজা সাফল্যে নয়, চেষ্টায়। আমাদের ওপর ভরসা কোরো না। অর্ক বলল।

—দুয়ো, দুয়ো, আত্মবিশ্বাস নেই একটুও।

ইন্দ্রাণী কাঁচকলা দেখালো অর্ককে। হেসে ফেলল অর্ক।

ওরা দুজন দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল। নৌকোটা ধীরে ধীরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—কাছেই শুনেছি একটা বাতিঘর আছে। আদিত্য বলল।

—কতটা দূর? আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল।

—প্রায় আড়াই কিলোমিটার। পাহাড়ি খাড়াই রাস্তা কিন্তু। হাঁটতে হবে। গাড়ি চলবে না।

—তাহলে তুমিই যাও।

—আপনি যাবেন নাকি? প্রজ্ঞাকে বলল আদিত্য।

—আমি পরে যাব। এখন আমি ওই উঁচু পাহাড়টার ওপর চড়ে সমুদ্র দেখব, আর ছবি আঁকব।

—আপনি ছবি আঁকেন?

—আঁকি, তবে খুব বাজে আঁকি। চেষ্টা করি। ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভালো করে ছবি আঁকা শিখিনি কোনোদিন। তুমি যাও। ফিরে এসে বোলো কেমন লাগল।

একাই গেল আদিত্য বাতিঘরের রাস্তায়। বাকি সবাই হই হই করে সমুদ্রে গেল স্নান করতে। প্রজ্ঞা হাঁটা লাগালেন দূরের ন্যাড়া পাহাড়টার দিকে।

এখন আকাশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ পথ দেখায় আধুনিক জাহাজগুলিকে। বাতিঘর তাই বাতিল, শুধু অতীতের স্মৃতি। কিন্তু তার জন্য বাতিঘরের রহস্য আর আকর্ষণ আরও বেড়েছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পাক্‌দণ্ডী বেয়ে হাঁটার পর সামনে পড়ল বাতিঘরটা। সাদা, উঁচু একটা স্তম্ভ, যেন এক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, নিজের প্রজাতির শেষ বংশধর। অনেক অনেক বছর ধরে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একা। নির্নিমেষ নয়নে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আশা, সমুদ্রের ওপার থেকে কেউ ওর খোঁজে আসবে। অন্তহীন প্রতীক্ষাতেই সময় কাটে বাতিঘরের।

সরু ঘোরানো সিঁড়ি অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। খাড়াই সিঁড়ি, কষ্ট করে উঠতে হয়। জায়গায় জায়গায় ঘুলঘুলি আছে, সেখান দিয়ে আলো আসে। পথ তাই দেখা যায়। সিঁড়ি আর শেষ হয় না। ঘর্মাক্ত কলেবরে আদিত্য যখন পৌঁছোলো সিঁড়ির শেষ ধাপে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। সামনের দরজা খোলা। কী আওয়াজ বাতাসের, যেন একটা রাগী জন্তু ক্রমাগত গর্জন করে চলেছে। দরজা দিয়ে বাইরে বাতিঘরের বারান্দায় বেরিয়েই মাথা ঘুরিয়ে উঠল, লোহার রেলিং শক্ত করে ধরে টাল সামলালো আদিত্য। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে, কানে তালা লেগে যায়। মনে হচ্ছে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে চারিদিক থেকে বান ডেকেছে মাথা খারাপ করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। কিছুক্ষণ সময় লাগল আদিত্যর, নিজেকে সামলাতে। কী অপূর্ব দৃশ্য। এত কষ্ট করে আসা সার্থক হলো। সামনের দৃশ্যপট জুড়ে আছে শুধু সমুদ্র আর আকাশ। ঘন নীল কুমেরু মহাসাগর, হিমশীতল, নির্দয়। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা ফেননিভ ঢেউ। সামনের সমুদ্রটা যেন আরেকটা আকাশ, সাদা ঢেউগুলো সেই আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘ।

সমুদ্রের ধারে ছোট্টো বর্ধিষ্ণু শহর। এখান থেকে নৌকো যায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে। শহরের আশেপাশে আছে চারণভূমি, অনেক গোরু চরে সেখানে। মাছ আর গোরুর দুধ, এই এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা। তাই এখানে বেশ কয়েকটা হিমঘর আছে। দুধ আর মাছ সংরক্ষিত থাকে সেখানে, প্রতিদিন গাড়ি আসে, হিমঘর খালি করে মাছ আর দুধ নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ ধরেই শ্রীজা মোবাইল নিয়ে খুটখাট করে যাচ্ছিল। এবার ড্রাইভারের সিটে বসা সুমিতকে বলল,

—এখানে মোবাইল রিসেপশন নেই। নেই মানে নেই, কিচ্ছু নেই। মোবাইলের জিপিএস কাজ করছে না। কী হবে এখন?

—দেখছি। চিন্তা করো না, রোডসাইন দেখে শহরের ইনফরমেশন সেন্টারে পৌঁছে যাব। সেখান থেকে একটা ম্যাপ জোগাড় করা যাবে।

কিছুদূর যেতেই সামনে দেখা গেল উন্মুক্ত সমুদ্র, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা সিগাল উড়ছে জলের ওপর। কাঠের তৈরি লম্বা ডেক পাড় থেকে সমুদ্রের গভীর পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছে, সার বেঁধে অনেক মাছধরা ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে সেই ডেকের ধারে। বাতাসে একটা চনমনে তাজা গন্ধ—সমুদ্রর লোনা গন্ধর সঙ্গে মিশে আছে মাছের আঁশটে গন্ধ। সমুদ্রের ধার ধরে চলেছে লম্বা একটা রাস্তা। সেই রাস্তারই ওপর দূরে দেখা গেল ইনফর্মেশন সেন্টার। তার ঠিক সামনে পেট্রোল স্টেশন। সেখানেই আগে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সুমিত। ট্যাঙ্ক প্রায় খালি। এই সুযোগে ভরে নেওয়া যাক।

ইনফরমেশন সেন্টারের ভদ্রমহিলা খুব ভালো। কাছেই একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আছে, তার সন্ধান দিলেন, শহরের একটা ম্যাপ দিয়ে দিলেন, কোথায় কি আছে সব বুঝিয়ে দিলেন। ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে টয়লেট, বাথরুম সবই আছে। গরম জলে স্নান করে সতেজ হয়ে ওরা বেরোলো খাবারের সন্ধানে। সমুদ্রের ধারেই একটা রেস্তোরাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। সেই সকাল থেকেই প্রায় কিছু খাওয়া হয়নি, গোগ্রাসে খেল দুজনেই। রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জলে রানি রং, সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে। হঠাৎ করেই রেস্তোরাঁর আলো সব নিভে গেল। কিন্তু তাতে ভালোই হলো, সূর্যাস্তের আকাশের সবটা রং রেস্তোরাঁর মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওরা দুজন অনেকক্ষণ ধরে জানালার ধারে বসে রইল, যতক্ষণ না সবটুকু রানি রং বিসর্জন দিয়ে সমুদ্র গাঢ় কালচে রং ধরল। রেস্তোরাঁর ভেতরে তখন ঘন আঁধার। ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে ফিরতে একটু অসুবিধে হলো, রাস্তাঘাট সব অন্ধকার।

—আকাশের রংটা কেমন হয়ে গেছে, না? শ্রীজা বলল।

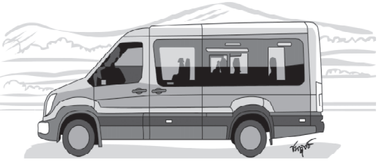

সবুজ আকাশ। শেওলা রঙের মেঘ ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে। গা ঘিনঘিনে সবুজ। রিমোট কন্ট্রোল প্লেন নিয়ে খেলছিল রেশমী আর গিনি। সঙ্গে বিবুও আছে। টকটকে লাল রঙের মডেল প্লেন, ডানায় ঈগলের মার্কা। দুহাতে প্লেনটা ধরে আকাশে ছুঁড়ে দিল গিনি, ঠিক যেমন করে ঘুড়ি ধরতাই দেয়। ডানা মেলে আকাশে উড়ল প্লেনটা। বোঁওঁওঁওঁ আওয়াজ করে এগিয়ে চলল মাঠের প্রান্তে, যেখান থেকে ঘন জঙ্গলের শুরু। প্লেন জঙ্গলের সীমান্ত স্পর্শ করার আগেই রিমোট কন্ট্রোলে রেশমীর কৌশলী হাতের চাপে প্লেনের মুখ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। হুররে! বলে গিনি চিৎকার করে উঠল। সবুজ আকাশের বুক চিরে লাল প্লেনটা মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে চলল, বারবার, বারবার। দমকা বাতাসের সঙ্গে একরাশ কুয়াশা উড়ে এল জঙ্গলের দিক থেকে। হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি দেখা দিল আকাশে, আচমকা মাঝ আকাশেই প্লেনটা উধাও হয়ে গেল। হেএএএএএ!!! চিৎকার করে উঠল রেশমী। চোখের ভুল নাকি? বিস্ময়ে বোবা গিনিও। রিমোট কন্ট্রোলের সুইচগুলো বারবার এলোপাথাড়ি টেপাটেপি কর চলল রেশমী, মাঠের এপার থেকে ওপার দৌড়ে খুঁজে চলল গিনি। নেই কোথাও নেই প্লেনটা। হতভম্ব বিবু বসে পড়ল মাটিতে।

****

নদীর ধার ধরে তাঁবু খাটানো হলো। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব নামানো হলো। খোলা আকাশের নীচে ফোল্ডিং টেবিল চেয়ার পাতা হলো। ছোট্ট দুটো গ্যাস বার্নার আর রান্নার বাকি সরঞ্জামও বার করা হলো।

"কোল্ড ড্রিঙ্কস কোথায় গেল?" আইস বক্স খুলে আত্রেয়ী অবাক।

ইন্দ্রাণী : সে কী। আইস বক্স ভর্তি ছিল, সেটা খালি হয়ে গেল কীকরে? এই বাচ্চারা, তোরা সব খেয়ে নিয়েছিস নাকি?

গিনি আর রেশমী সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। অর্ক বাধা দিয়ে বলল, "বেড়াতে এসে এতসব হিসেব করতে নেই। ফুরিয়ে গেছে তো কী হয়েছে, আমি নিয়ে আসছি।"

বাচ্চারা তখনো প্রতিবাদে মুখর—কোল্ড ড্রিঙ্কস ফুরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওরা কিছুই জানে না।

রাস্তা থেকে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি পার্ক করল অর্ক। সাবধানে ডালপালা বাঁচিয়ে গাড়ি থেকে বেরোলো। রাস্তার ধার ধরে নাক বরাবর সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। জঙ্গল থেকে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, বরফের মতো ঠাণ্ডা জোলো বাতাস। কিছুদূর যেতেই সামনে দেখতে পেল সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপটা। উঁচু গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে ফানেলের মতো দেখতে একটা বিরাট গম্বুজ। তার পেছনেই একসারি চিমনির গায়ে শুধু কালো দাগ। মোবাইল বার করে ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিল, তারপর ছবিগুলো ডিলিট করে দিল। আশেপাশে দু' একটা বাড়ি নজরে পড়ছে ধীরে ধীরে। নিথর নির্বাক, মৃত শহর। রাস্তার ধারে একটা বড়ো অন্ধকার গাছের পেছনে নজরে পড়ল একটা খাবারের দোকান, সাইনবোর্ড লাগানো আছে 'কান্ট্রি পেস্ট্রি অ্যান্ড পাই শপ'। সাইনবোর্ডের একদিকের পেরেক খুলে গেছে, কাত হয়ে ঝুলছে ফলকটা। দরজার ওপর একটা জরাজীর্ণ কাঠের টুকরো ঝুলছে, তাতে কালো কালি দিয়ে লেখা আছে 'ওপন'। দরজা খুলে দোকানটায় ঢুকলো অর্ক। টিং করে একটা আওয়াজ হলো কোথাও, চমকে ওপরে তাকালো অর্ক। দরজার সঙ্গে একটা ঘন্টি লাগানো ছিল, দরজা খুলতে গিয়ে সেটা বেজে উঠেছে। ঘন্টির আওয়াজ শুনে ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। বেশ বয়স হয়েছে লোকটার। সাদা চুল, সাদা ভুরু, কুঁচকানো চামড়া ক্লান্ত চলার ভঙ্গি। চেনা-চেনা।

—গরম খাবার কিছু পাওয়া যাবে?

—মাংসের পাই চলবে?

—খুব চলবে।

দশ মিনিটের মধ্যে একটা মাংসের পিঠে এনে দিল লোকটা। গরম, ওপরের মুচমুচে স্তরটা ভাঙতেই হালকা ধোঁয়ার সঙ্গে টাটকা মাংসের ঝোলের সুগন্ধ বেরিয়ে এল। খেতে খেতে আলাপ হলো লোটকার সঙ্গে। নাম স্যাম্, গত তিরিশ বছর এই শহরের বাসিন্দা। শহরের ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে গত ন'বছর যাবৎ। চীনের থেকে সস্তার জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর প্রায় সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে।

অর্ক : আপনি গত তিরিশ বছর এখানে আছেন? তার আগে কোথায় থাকতেন? আপনাকে তো এই এলাকার লোক বলে মনে হচ্ছে না।

স্যাম : কেন বলুন তো?

অর্ক : কুর্দ আর ইরানিদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের চেহারায় প্রচুর মিল, কিন্তু অমিলও আছে। আপনার উচ্চারণ ঠিক ইউরোপীয় অস্ট্রেলিয়ানদের মতো, সেখানে কোনো খুঁত নেই। কিন্তু আপনি মূলত কুর্দিশ। আপনার মুখের গড়ন সেটা বলে দিচ্ছে।

স্যাম : ননসেন্স! আপনার খাওয়া শেষ হলো? তাহলে এবার বিদেয় হন, আমি দোকান বন্ধ করব।

অর্ক : অনেক ধন্যবাদ। পাইটা খুব ভালো খেতে। স্বাদটা বহুকাল মনে থেকে যাবে।

অর্ক পকেট থেকে টাকা বার করে টেবিলে রাখলো। লোকটা হাত বাড়ালো টেবিলের দিকে। ঠিক তখনই অর্ক চকিতে ওর ডান হাত বাড়িয়ে লোকটার মাথাটা চেপে ধরলো। পরমূহূর্তেই লোকটার মাথাটা আছড়ে পড়ল টেবিলে। আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ল টেবিলটা, তার ওপর এলিয়ে পড়ল লোকটার রক্তাক্ত নিথর দেহ। মাথার খুলিটা তুবড়ে গেছে, যেন একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি।

আহমদ বিন আরাশ আল কুর্দি। আইসিসের পতন হওয়ার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার এই জনবিরল এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। পরিত্যক্ত এই শহরের এক দোকানদারকে খুন করে তার আইডেন্টিটি আত্মসাৎ করে জমিয়ে বসেছিল, কেউ সন্দেহ করেনি। এখান থেকেই আইসিস পূর্ব খোরাসান চ্যাপ্টারের সংগঠন সামলাচ্ছিল, গজওয়া-এ-হিন্দের পরিকল্পনা করছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অর্ক। আল কুর্দি। বহু লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অর্কর দুঃস্বপ্নের জন্যও দায়ী এই লোকটা তাই এই লোকটার শেষ নিজের চোখে দেখাটা প্রয়োজন ছিল। হয়তো এবার দুঃস্বপ্নের ইতি হবে।

ইয়াচি দেহী, ইয়াচি ডোলা। এই চোখে এই দেহে। এখন আমার পঞ্চাশ বছর বয়স। আর হয়তো মেরেকেটে পঁচিশ বছর বাঁচব। পৃথিবীর ছাদ জুড়ে যে জাল বিছিয়েছি, তাকে এই পঁচিশ বছরের মধ্যেই গুটিয়ে তুলতে হবে। সময় নেই, সময় নেই, চিরনিদ্রার আগে, দীর্ঘ এক পথ।

হাতে একটু রক্ত আর চুল লেগে আছে। ডান হাতের দস্তানাটা খুলে ফেলল অর্ক। ভেতর থেকে ওর ধাতব হাত বেরিয়ে এল। পকেট থেকে আরেকটা দস্তানা বার করে পরে নিল। দস্তানাটা চামড়ার রঙের, ঠিক হাতের মতো দেখতে। পুরোনো দস্তানাটা উলটো করে পকেটে রেখে দিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে সেটা দিয়ে দোকানের ফ্রিজ থেকে সাবধানে কয়েকটা কোল্ড ড্রিংকসের বোতল তুলে ব্যাগে ভরল অর্ক। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাইয়ের দোকানের ঠিক পেছনে একটা জলাশয় আছে, সেটার পাশ দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ওপর ঘন হয়ে এসেছে

গাছপালা, ছায়ায় অন্ধকার হয়ে রয়েছে রাস্তা। বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে এল। পাইয়ের দোকানের পেছনে একটা ডাস্টবিন উপচে পড়ছে, পচে গন্ধ বেরোচ্ছে। বিবর্ণ নীল রক্তে ভরে আছে জায়গাটা। নাক সিঁটকে রাস্তা ধরে এগোলো অর্ক।

পুরোনো দস্তানাটা মনে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

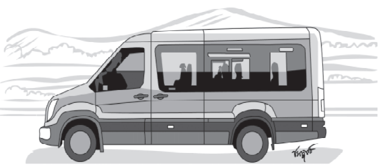

রাত্রি নামছে। আত্রেয়ী হঠাৎ হইচই করে উঠল—এস, এই দেখে যাও, আকাশে কীরকম একটা আলো। সত্যিই তো, আকাশে রঙের বান ডেকেছে। গোটা আকাশ জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য আগুনের শিখা। নানান রঙের আগুন। সবুজ, নীল, বেগুনি, আরও কত রং। মনে হচ্ছে কোথাও একটা বিরাট জলসা হচ্ছে, যার রোশনাইয়ে আকাশ মুহুর্মুহু আলোয় আলো হয়ে যাচ্ছে। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত শুধু আলোর চাদর, ছটফটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য আলোর বুদবুদ নেচে বেড়াচ্ছে, ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আলো। কোনো ঢেউ প্রচণ্ড গতিতে দৌড়ে চলেছে, কোনোটা আবার মন্দতালে চলছে। প্রায় দুঘণ্টা চলল এই মহাজাগতিক দীপাবলী। শেষে সৃষ্টি জুড়ে নামলো ঘন অন্ধকার। সবাই চুপ, যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। বিবু শুধু অস্ফুটস্বরে বলল, 'অরোরা অস্ট্রালিসা।'

অর্ক ইতিমধ্যে জঙ্গল থেকে একরাশ কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন ধরিয়েছে। তীর্থঙ্কর গাড়ির পেছনে থেকে এক বস্তা কাঠ নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে থেকে মাঝারি সাইজের একটা কাঠ আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কাঠটা আগুন ধরে ফেলল। বস্তা থেকে এবার বড়ো একটা কাঠের টুকরো বার করে আগুনে আহুতি দিল অর্ক।

''ব্যাস'', বলল অর্ক, ''এই বড়ো কাঠটা যদি একবার আগুন ধরে নেয়, তাহলে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত।''

''অর্ক'', সুনন্দ হঠাৎ করে বলল, ''তোর ডান হাতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?''

''কেন বল তো?'' চমকে উঠলো অর্ক।

''না, এমন কিছু নয়। যখন তুই দু'হাত দিয়ে বস্তা থেকে কাঠের টুকরোটা বার করলি, তখন আগুনের আলোয় পরিষ্কার মনে হলো, তোর ডান হাতটা কেমন যেন আড়ষ্ট। ওই হাতটা কি কোনো প্যারালিটিক শক পেয়েছিল?''

''বাতাসে কী মিষ্টি গন্ধ!'' বলল অর্ক, ''এটা কি সমুদ্রের গন্ধ, না জঙ্গলের গন্ধ, নাকি জংলি ফুলের গন্ধ? বোধহয় সব মিশে গিয়ে এই গন্ধটা তৈরি করেছে। অনেককাল পরে এত কাছ থেকে সমুদ্র দেখলাম।''

সবাই ততক্ষণে আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। আড্ডা আজ জমছে না, সবার দৃষ্টি আকাশের দিকে। শ্যাওলা রঙা মেঘ সরে গিয়ে আকাশ এখন পরিষ্কার। সাগরের জলে স্নান করে চাঁদ উঠেছে আকাশে, অর্ধেক শরীর তার কালো ছায়ার তোয়ালেতে ঢাকা। স্নানসিক্তা সেই চাঁদের গা থেকে এখনো টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে, চাঁদ তাই এত উজ্জ্বল। সঙ্গ দিতে এক এক করে তারা ফুটছে আকাশে। শহরের আলো সব তারাদের ঢেলে দেয়। সেই সব অবহেলিত তারারা সবাই আজ এখানে এসে জুটেছে। হিরের কুচির গালিচা আকাশ জুড়ে ছড়ানো। সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে সাউদার্ন ক্রস তারকাপুঞ্জ। শুধু, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকেই এই তারকাপুঞ্জ দেখা যায়। রাত বাড়ছে, চাঁদ সরছে। সরছে সাউদার্ন ক্রসও।

ইন্দ্রাণী : মনে হচ্ছে চাঁদ যেন সাউদার্ন ক্রসকে তাড়া করছে, তাই না?

মদালসা : আচ্ছা, আগামীকাল কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

প্রজ্ঞা : কোথাও যাওয়ার কি দরকার আছে? কালকের দিনটা এখানেই থাকি না কেন?

আত্রেয়ী : ভাবছিলাম কাল দল বেঁধে সবাই মিলে মোহনার পাড় ধরে সমুদ্র পর্যন্ত হাঁটবো। তারপর সমুদ্রের পাড়ে চড়ুইভাতি করা হবে। কেমন হবে?

জঙ্গলের মধ্যে একটা পায়ে চলার রাস্তা আছে, সমুদ্র থেকে সোজা নদীর পাড় পর্যন্ত গেছে। সবাই সেটা ধরে ফিরে এল নদীর তীরে, যেখানে তাঁবু খাটানো হয়েছে। যে যার তাঁবুতে শুতে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না অর্কর। তাঁবুর মধ্যে কি গুমোট বোধ হচ্ছে? বাইরে একটু হাঁটলে বোধহয় ভালো লাগবে। পায়চারি করতে করতে অন্যমনস্ক অর্ক সমুদ্রের দিকের পায়ে চলার রাস্তাটা ধরল। এত কুয়াশা কেন? ভালো করে দেখা যায় না পথ। সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও একটা শব্দ ভেসে আসছে। অনেক ঢাকের মৃদু ধ্বনি, একসাথে একতালে বাজছে ঢাকগুলো। একটু এগোতেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সমুদ্রের তীর। চাঁদনি রাত, সমুদ্রের হাজার ফণা ফসফরাস মেখে জ্বলছে। এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। যেন অজস্র সাপ, মাথায় তাদের জ্বলছে সর্পমণি, বারে বারে নিস্ফল আক্রোশে ছোবল মারছে মাটির বুকে। সমুদ্রের ধারে একটা আগুন জ্বলছে, তাকে ঘিরে একদল লোক ঢাক বাজাচ্ছে, নাচছে। তাদের চকচকে বাদামি চামড়ায় চাঁদের আলো বারবার পিছলে যাচ্ছে।

একরাশ কুয়াশা উড়ে বেড়াচ্ছে। বারবার দৃশ্যপট মুছে নতুন দৃশ্য আঁকছে। পরতের পর পরত মেঘ আকাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গায়ে ধীরে ধীরে

লাগছে সোনার রঙের আভা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা ত্রিভুজাকৃতি মন্দিরশীর্ষ। পদমূলে সবুজ মরূদ্যান। অনেক ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। ঝলমলে সূর্য উঁকি মারলো পাহাড়ের পেছন থেকে। আকাশ কমলা রঙে মাখামাখি। ক্ষীণ একটা গানের সুর ভেসে আসছে মন্দির থেকে।

হঠাৎ করেই আকাশের দিকে চোখ পড়ল। একটা তারা আকাশ থেকে খসে পড়ছে। ক্রমশ বড়ো হতে হতে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে যাবার পরমুহূর্তে কানে তালা লেগে গেল বিস্ফোরণের শব্দে। গেল, সব শেষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেল। তার সঙ্গে ভেঙে খানখান হয়ে গেল স্বপ্নটা। চমকে বিছানায় উঠে বসলো অর্ক। আবছা অন্ধকারে চোখ মেললো। কোথায় আমি? এত অন্ধকার কেন চারপাশে? ঘুম ভাঙ্গলো, নাকি এটাও একটা স্বপ্ন? দিন আর রাত্রি, বাস্তব আর স্বপ্ন, সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে আজকাল।

ক্ষীণ একটা আলো রয়েছে গুহার অন্যদিকে। সেখানে পাথরের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়ালে খোদাই করা বিশাল একটা ময়ূর, ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই। তারই সামনে জ্বলছে কয়েকটা মাটির প্রদীপ। গুনগুন স্বরে গান ভেসে আসছে সেদিক থেকে। নাডিয়া গাইছে। আর কাঁদছে। কাঁদছে নিজের ভাগ্যের ওপর অভিমানে। কাঁদছে ময়ূর-অবতার তাওসি মেল্যাকের ওপর অভিমানে। কেন তাওসি মেল্যাক এতবড় বিনাশ আটকালেন না। কেন! কেন!

বাইরের পৃথিবীটা এখন কেমন, কে জানে। কিন্তু সর্বগ্রাসী বিনাশের মুহূর্তটা কেমন হতে পারে, সেটা কল্পনা করতে পারে অর্ক। আর সেই মুহূর্তটা বারবার ফিরে আসে মনের মধ্যে। এটা একটা মানসিক অসুখ, সেটা অর্ক জানে। পি.টি.এস.ডি-পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার।

এই পাহাড়ের কোনো একটা গুহাতে নাডিয়ার জন্ম। এতটা বড়ো হয়েছে ও, সেও এই পাহাড়ের গুহাগুলোতে লুকিয়ে থেকেই। শিশু বয়সেই চোখের সামনে দেখেছিল নিজের বাবা আর ভাইদের খুন হতে। মা আর দিদিদের ধর্ষিত হতে, অপহৃত হতে। সেদিন থেকেই যাযাবর উঞ্ছবৃত্তির জীবন ওর। তবু কোনোদিন নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেয়নি। অভিমান করেনি তাওসি মেল্যাকের ওপর। আজ করছে। কেন তাওসি মেল্যাক এমনটা হতে দিলেন! কেন! কেন!

হাজার হাজার বছরের পুরোনো গুহার জাল ছড়ানো পাহাড়ের অভ্যন্তরে, গোলকধাঁধার মতো। কে বানিয়েছিল এই গুহাগুলো? নাডিয়া বলেছিল, অনেক অনেককাল আগে ওর পূর্বপুরুষ পূর্বনারীরা যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভারত থেকে এই মরুভূমির দেশে এসেছিল, তখন ওদের সৈন্যদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাওসি মেল্যাক নাকি এই গুহাগুলো বানিয়েছিলেন। গুহাগুলোর প্রতিটি রন্ধ্র নাডিয়া চেনে নিজের হাতের তালু মতো। ও আগে থেকে না চিনিয়ে দিলে অর্ক কখনোই এই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে পথ চিনে নীচে নামতে বা ওপরে উঠতে পারতো না। একটা অন্তঃসলিলা নদীর উৎসমুখ আছে গুহার মধ্যে। জলের অভাব হবে না কোনোদিন। কিন্তু জমানো শুকনো খাবার অপর্যাপ্ত নয়। একদিন সেটা শেষ হবেই। তখন কী হবে?

গুহার দেওয়ালে সারবন্দি প্রচুর ছবি চোখে পড়েছিল। অনভিজ্ঞ চোখে অর্থহীন মনে হবে। কিন্তু মার্শাল আর্টে অভিজ্ঞ অর্কর মনে হয়েছিল, ছবিগুলোর একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এটা কি কোনো ব্যায়াম পদ্ধতি? সারাদিন কোনো কাজ নেই, তাই ছবিগুলো দেখে সেই পদ্ধতি অভ্যেস শুরু করল। সেই করতে করতেই বিলুপ্ত এক বিদ্যা ধরা দিল অর্কর কাছে। লঘিমা ও আয়ুধকলা— দুই বিদ্যার মিশ্রণে তৈরি এই অভিনব বিদ্যা, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র আবিষ্কার, বহু সহস্রাব্দ পরে আবার কেউ শিখল। ছ'মাস দিনরাত্রি একাগ্রচিত্তে অভ্যাসের শেষে এল সিদ্ধি, একঝলক চোখ ধাঁধানো আলোর মতো।

আমি অর্ক। আমার দেশ ভারতবর্ষ। আমি ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'আর অ্যান্ড এ ডব্লিউ'-এর এজেন্ট। আমার মিশন, ভারতবিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবর জোগাড় করা, আর সেসব কার্যকলাপ সাধ্যমতো বানচাল করা। ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে ও। বহু বছর ধরে করে আসছে সেটা। এখন, মাটির এই এতটা নীচে দিন-রাতের বিশেষ কোনো তফাত নেই। বাইরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আত্মবোধ হারিয়ে যায়, মাথা খেই হারিয়ে ফেলে। তাই প্রতিবার ঘুম ভাঙ্গলেই কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে। যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম তাকে রক্ষা করে। ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

র-এর আপ্তবাক্য, সংগঠনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বুকে নিয়েই বহু বছর আগে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে ছেড়ে এসেছিল। বিস্মৃত এক গিরিবর্ত্ম বেয়ে হিমালয় পার হবার সময় পেছন ফিরে শেষবারের মতো চোখ ভরে দেখেছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশটাকে। ছদ্মনাম আর ছদ্মপরিচয় সম্বল করে কাশ্মীরের সীমান্ত পার হয়েছিল। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানে। তেহরিক-ই-তালিবান থেকে জৈশ-এ-মহম্মদ, তারপর আইসিস। ক'বছরের মধ্যেই আইসিসের এরিয়া কমান্ডার হয়ে উঠেছিল। তখনই কানাঘুষোয় শুনেছিল 'অপারেশন দজ্জাল'-এর কথা। কিছু সন্দেহজনক ট্রাক মাঝে মাঝেই গোপন কার্গো নিয়ে পাকিস্তানি এয়ারবেসগুলো থেকে করাচি যেত। খবর ছিল, সেখানে থেকে ট্রাকের মালপত্র সোজা যেত ইরাকের মসুলে। ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় বারবার সতর্ক করছিল, বড়ো কিছু একটা ঘটতে চলেছে সেখানে। তাই ঘুষ দিয়ে আইসিসের হেডকোয়ার্টারে ট্রান্সফার নিয়েছিল ও। বছরটা

ছিল ২০০৪। ভারতের নতুন সরকার 'র' ব্যাপারটাকেই প্রায় উঠিয়ে দিল। ইরান থেকে সৌদি বহু শত এজেন্ট খুন হলো রাতারাতি। অর্কর কাছে তখনও সুযোগ ছিল, দেশে ফিরে আই পি এসের চাকরিতে কলম পিষে আর নেতাদের পাহারা দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটিয়ে দেওয়ার। কিন্তু গুলি একবার বন্দুক থেকে বেরিয়ে গেলে লক্ষ্যে না পৌঁছে থামে না। ভারত সরকার ওকে পরিত্যাগ করল। অর্ক তবু মিশন পরিত্যাগ করল না।

মসুলেই ও প্রথম দেখেছিল কাশেম আল হিন্দিকে। অপারেশন দজ্জাল-এর মাস্টারমাইন্ড আহমদ আল কুর্দির ডানহাত। পূর্বনাম সমীর সরকার, আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার ফুলেশ্বরী গ্রামে। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ছিল। সেটা ছিল পনেরোই আগস্ট, ছুটির দিন। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার পাশে বসে পাওভাজি খাচ্ছিল, সঙ্গে এক সহকর্মী বিজ্ঞানী। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি চালিয়েছিল কেউ, সম্ভবত কোনো সিআইএ এজেন্ট। ওর চোখের সামনেই ঝাঁঝরা হয়ে যায় সহকর্মীর দেহ, ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় সমীর। সেই ঘটনার কোনো তদন্ত হলো না। সরকারের ওপর রাগে আর অভিমানে ধর্মান্তরিত হলো সমীর, আইসিসে যোগ দিল। গড়পড়তা মাথামোটা আইসিসের লোকেদের মধ্যে কাশেমকে আলাদা করে চেনা যেত সহজেই। নাকের ডগায় চশমা, হাতে মোটা একখানা ফিজিক্সের বই, অন্যমনস্ক, সবসময় কী যেন ভেবে চলেছে। ফিজিক্সে অনার্স ছিল অর্কর। আইপিএস পরীক্ষায় বসার আগে ইচ্ছে ছিল, মাস্টার্স করবে, ডার্ক ম্যাটার নিয়ে ডক্টরেট করবে। সেই জ্ঞান অবলম্বন করে কাশেমের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করতে অসুবিধে হয়নি।

আর একটা সুবিধে হয়েছিল। কাশেম ওর সব গোপন কথা বাংলায় লিখে রাখত। ও জানতোই না, ওর ঘাড়ের কাছে বসে আছে যে পাঠান এরিয়া কমান্ডার, সে আসলে বাঙ্গালি! ধীরে ধীরে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো এক এক করে বাধা অপসারণ করে শেষপর্যন্ত জানতে পেরেছিল অপারেশন দজ্জাল-এর স্বরূপ। কিন্তু ততক্ষণে বড্ডো দেরি হয়ে গেছে।

আইসিসের মোডাস অপারেন্ডির মূলে আছে লাগাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আর সেই জনসংখ্যাকে জেহাদি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধে নামানো। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যার ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। প্রযুক্তির জোরে বোতাম টিপে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে মিনিটে লক্ষাধিক শত্রু নিপাত করা যায়। একজন ফাইটার পাইলটের বুদ্ধি, জ্ঞান আর একাগ্রতা বেশি দরকার। গায়ের জোর আর হিংস্রতার তুলনায়। আইসিসের নেতৃত্ব জানে, পৃথিবীর শিক্ষিত শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তিতে কখনই এঁটে উঠতে পারবে না ওরা। না পারবে তাদের সঙ্গে বুদ্ধি, জ্ঞান আর একাগ্রতায় টক্কর দিতে। তাই পৃথিবীজোড়া আইসিস সাম্রাজ্যের স্বপ্ন অধরাই রয়ে যাবে চিরকাল। যদি না পৃথিবী থেকে প্রযুক্তি ব্যাপারটাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়। মানব সভ্যতাকে আদিম অবস্থায় এনে ফেলা যায়, যাতে লড়াইটা মিলাইল আর ফাইটার প্লেনের নয়, তির-ধনুক আর ঢাল-তরোয়ালের হয়।

আইসিসের পরিকল্পনা, পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ জায়গায় একযোগে অনেকগুলো পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো। যাতে মানবসভ্যতা ও তার যাবতীয় প্রযুক্তি একসাথে ধ্বংস হয়ে যায়। সেটা ঘটতে চলেছে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

পরিকল্পনাটা জানতে পেরে শিউরে উঠেছিল অর্ক। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল মসুলের রাস্তায় রাস্তায়। এক এক করে প্রতিটি ডিপ অ্যাসেটের দরজায় কড়া নেড়েছিল। কোনোভাবে যদি খবরটা ভারতে পাঠানো যায়। যদিও জানতো, সেখানে খবর পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই। হাত কামড়াচ্ছিল নিজের অসহায়তার কথা ভেবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা রয়েছে ওর হাতে। কিই-বা করতে পারবে ও, এই কয়েক ঘণ্টায়? ঠিক সেই সময়েই দেখা হয়েছিল নাডিয়ার সাথে।

তাহারুশ। উৎকট বীভৎস এক বিনোদন। পথচলতি যুবকরা জড়ো হয়ে পথচলতি একটি যুবতীকে বেছে নেয়। প্রথমে মেয়েটিকে ঘিরে ধরে ভয় দেখায়। উত্যক্ত করে। জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। যৌন নিপীড়ন চালায়। শেষে প্রকাশ্যে সবার সামনে খোলা রাজপথে গণধর্ষণ করে। পথচলতি লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেয়, নির্দেশ দেয়। রাক্কা আর মসুলের পথেঘাটে এ ঘটনা বহুবার দেখেছে অর্ক। দেখেও মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, পাছে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। সেদিন আর নিজেকে সামলানোর ইচ্ছে হয়নি। সব তো শেষ হয়েই যাচ্ছে, তাহলে আর ধোঁকার ট্যাটি বজায় রেখে কী হবে?

উজবেগ ভাষায় 'তেমির মুষ্ট' মানে লৌহমুষ্টি। অর্কর ডান হাতটা কবজি থেকে বাদ গিয়েছিল তাজিক-উজবেগ বর্ডারে একটা অপারেশনে। সেদিন থেকেই টাইটেনিয়াম আর কার্বন ন্যানো ফাইবারের তৈরি রোবোটিক এই নকল হাতটা ওর সঙ্গী। নাডিয়াকে যারা আক্রমণ করেছিল, এক এক করে সেই পনেরোটা ছেলেকেই থেঁতলে মেরে ফেলেছিল ও, এই হাতটা দিয়ে। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল প্রত্যেকটা খুন, যেমন করে বেড়ালে ইঁদুর মারে। ভীষণ আনন্দ হয়েছিল সেদিন। বহু বছরের অবদমিত ক্রোধ জ্বালামুখীর মতো ফেটে বেরিয়ে এসেছিল একসঙ্গে।

ঘটনাটার শেষে আশ্রয় ওরা নিয়েছিল এই গুহায়। নাডিয়াই পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল।

বিব্রতকর ঘটনা। ওঃ, সেই ঘটনাটার থেকে বিব্রতকর ঘটনা অর্কর জীবনে আরেকটা ঘটেনি। সান্দাকফুতে গরম জলের

বোতল জমে বরফ হবার ঘটনাটা তো কিছুই নয় ওটার তুলনায়। প্রায় ছয় মাস মাটির তলায় লুকিয়ে থাকার পর বাইরে বেরোলো অর্ক। ভেবেছিল দেখবে, মসুল শহর ধুলোয় মিশে গেছে। অবাক কাণ্ড! শহরটা যেমন ছিল তেমনি আছে। তাহলে? অপারেশন দজ্জাল? পরমাণু বোমা? কী হলো সেসবের? টাইগ্রিস নদীর ধারে মাছের বাজারের দোকানদার আহমদ খালিলি ছিল ওর হ্যান্ডলার। সোজা তার কাছেই গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী? উত্তর শুনে চমকে গেল অর্ক। বিধাতা কী অদ্ভুতভাবে কাজ করেন, আমরা সাধারণ মানুষরা তার কিছুই টের পাই না।

''কী আর বলব স্যার'', বলেছিল আহমদ ''কাশেম আল হিন্দিকে কে যেন রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো লোকটা, সুযোগ পেলেই তাহারুশ খেলায় ঢুকে পড়ত। ভেবে দেখুন, এত প্রতিভাধর একটা লোকের কী মানসিক বিকৃতি। সেই খেলা খেলতে গিয়েই খুন হলো লোকটা। মুশকিল হয়েছে, কাশেমের কাছেই ছিল সবকটা পরমাণু বোমার অ্যাকটিভেশন কোড। লোকটা সত্যিই পাগল ছিল। পাছে চুরি হয়, তাই কোডগুলো কোথাও লিখে রাখেনি, মুখস্থ করে রেখেছিল। এখন অ্যাকটিভেশন কোডের অভাবে সবকটা পরমাণু বোমা অচল হয়ে গেল। পুরো পরিকল্পনারই মাঠে মারা গেছে। আইসিসের লোকেরা খেপা কুকুরের মতো আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে আহমদ আল কুর্দি। ওদের সন্দেহ, আপনিই কাশেমকে খুন করেছেন। এতদিন খুঁজে না পেয়ে ধরে নিয়েছে, আপনি এ মুলুকে আর নেই। তবুও, এলাকায় থাকা আপনার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।''

জয় মা। মনে মনে মা কালীকে শতকোটি ধন্যবাদ জানিয়েছিল অর্ক। কে জানত, মাথা গরমের বশে ঘটিয়ে ফেলা একটা খুনোখুনি এভাবে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

''আপনার জন্য নতুন নির্দেশ আছে'', বলল আহমেদ, ''দিল্লিতে নতুন সরকার এসেছে, জানেন না বোধহয়। আপনার নতুন মিশন আফগানিস্তানে। কাগজপত্র তৈরি আছে, আমার গাড়িটা গ্যারাজে আছে, ওটা নিয়ে এক্ষুনি রওনা হয়ে যান।''

কিন্তু নাড়িয়া? মনে হয়েছিল, নাড়িয়াকে গুহা থেকে বের করে এনে তারপর অন্য কাজ। কিন্তু কেউ যদি ওর সঙ্গে নাড়িয়াকে দেখে ফেলে? আইসিসকে বলে দেয়?

নাড়িয়া। অর্কর প্রথম ও শেষ প্রেম। ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি এ জীবনে। এক সপ্তাহ পরে তেমির মুষ্ঠ নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাকদণ্ডিতে। মোয়াব বোমাটা ওর সামনেই পড়েছিল। আর তারপর থেকেই মানসিক ব্যাধিটা আবার ফিরে এসেছে। রোজ রাতে ও স্বপ্নে দেখে পরমাণু বোমার আঘাতে পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে। মোয়াব তো পরমাণু বোমা নয়। তবু স্মৃতির পর্দায় দুটো কোথায় এক হয়ে গেছে।

বড্ডো কুয়াশা চারপাশে। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রাম। বঙ্গের গ্রাম। একটা কুঁড়েঘর। সামনে তরকারি বাগান, পেছনে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে চিকচিকে নদী বয়ে যাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঘরের গোবর নিকানো দাওয়ায় বসে রান্না করছে, ওটা কে?

নাড়িয়া? লালপাড় সাদা শাড়ি পরনে, হাতে শাঁখা পলা লোহা। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, তিন গুণের প্রতীক। নালতে শাক আর কুচো মাছ রান্না করেছে, অর্কর জন্য। বাতাসে গরমভাতে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ। ঠাণ্ডা বাতাসে চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল। সামনে বিশাল সমুদ্র। কিন্তু এ সমুদ্রের সঙ্গে চেনা কোনো সমুদ্রের মিল নেই। সবুজ সমুদ্র। গা ঘিনঘিনে শেওলা রঙের সমুদ্র। নিস্তরঙ্গ, যেন বিরাট একটা জলা। কিন্তু জলা নয়। জলার তো ওপার থাকে। এই জলা অনন্ত। আকাশের রঙেও শ্যাওলা আভা। অনুভব করল অর্ক, এ সমুদ্রটা জীবন্ত। শুধু তাই নয়, এই জগতে এই সমুদ্রটা ছাড়া আর জীবন্ত কিছু নেই।

ঘুম ভেঙে গেল। বুকল্যাম্প জ্বালিয়ে একটা বই খুললো— এডুইন অ্যাবটের ফ্ল্যাটল্যান্ড। দু'এক পাতা পড়তে পড়তেই আবার ঘুম এসে গেল। কে এটা, ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে? ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস। শিউরে উঠে পেছন ফিরে দেখল, একটা সাপ। চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না। বোবায় ধরেছে। খুব গরম লাগছে। সনার অভ্যন্তরের মতো গরম। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কাঁপুনি ধরছে সারা শরীরে। একটা পাখি। অনেককাল ধরে উড়ছে। এখনো বাসায় ফিরতে পারেনি। বাসার পথটাই তো হারিয়ে গেছে। নাকি পাখিটা অন্ধ হয়ে গেছে? দুই ডানায় অনেক ব্যথা, অনেক ক্লান্তি জমে আছে। ভয় হয়, আর উড়তে পারবে কি পাখিটা? নাকি দুম করে মাটিতে পড়ে যাবে? না না, পড়ে গেলে চলবে না। ইয়াচি দেহী ইয়াচি ডোলা। চিরনিদ্রার আগে, দীর্ঘ এক পথ।

সারারাত একের পর এক দুঃস্বপ্ন দেখে চল অর্ক।

বিশ্রী গরম পড়েছিল। দুপুর থেকেই তাপমাত্রা চল্লিশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। সন্ধ্যেবেলায় ওরা ফিরছিল ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে। শ্রীজা গাড়ি চালাচ্ছিল, সুমিত পাশের সিটে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিশ্রী গন্ধে ছটফট করে উঠল শ্রীজা। কোথা থেকে আসছে এই গন্ধটা? ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের আশেপাশে গাড়িটা নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে এল। শেষমেশ গাড়ি থামিয়ে

ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল সুমিতকে। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে কিছুক্ষণ বুঝতে সময় লাগে, জায়গাটা কোথায়। চোখ বুজে সেটাই ভাববার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় বিশ্রী একটা গন্ধ এসে ধাক্কা দিল সুমিতের নাকে।

—কী হলো? নাক কুঁচকালো সুমিত।

—দেখেছ? কী বিশ্রী গন্ধ! কাল রাতেও ছিল না।

—বোধহয় পাবলিক টয়লেটটা থেকে আসছে। কেউ ওটাকে পরিষ্কার করেনি।

—আমি দেখে এসেছি। গন্ধটা টয়লেট থেকে আসছে না।

—তবে কোথা থেকে আসছে?

—মনে হচ্ছে শহরের দিক থেকে।

—মানে?

—মানে আমি কী জানি?

—দাঁড়াও, আমি শহরের দিকটা একবার ঘুরে আসছি। ডিনারের জন্যও কিছু নিয়ে আসব।

—এই গন্ধের মধ্যে আমি ডিনার করতে পারব না।

—সারারাত না খেয়ে থাকবে নাকি?

—গাড়িটা নিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

—প্রায় এক ঘণ্টা পরে সুমি ফিরল।

—কী হয়েছিল, এতক্ষণ লাগল? আমি চিন্তা করছিলাম।

—শহরের অবস্থা ভালো নয়। সারাদিন নাকি দোকানপাট কিছু খোলেনি।

—কেন?

—কাল রাতে সেই যে পাওয়ার অফ শুরু হয়েছিল, এখনো কারেন্ট আসেনি।

—তো?

—আরও কাণ্ড হয়েছে। কোথাও নাকি ফোন করা যাচ্ছে না। সব ফোন একসঙ্গে ডেড হয়ে গেছে। ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন, সব! একমাত্র পুলিশের রেডিয়ো কাজ করছে, কিন্তু পুলিশরা কিছুই খোলসা করে বলছে না। শুধু গম্ভীর মুখে শহরের রাস্তায় পেট্রলিং করে যাচ্ছে।

—নিশ্চয়ই কিছু বড়োসড়ো গোলমাল হয়েছে। কিন্তু এই পচা গন্ধটা....

—এখানে যে মাছ আর দুধের কোল্ড স্টোরেজগুলো আছে, সেগুলোতে কারেন্ট নেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। মাছ, দুধ সব পচে গেছে।

—মানে? প্রতিদিন ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি আসে না, ওদের কোল্ড স্টোরেজ খালি করে সব নিয়ে যেতে?

—আসে তো। কিন্তু কাল রাতে কেউ আসেনি। আজ সারাদিনও কেউ আসেনি।

—গাড়ির মধ্যে বসে রইল সুমিত আর শ্রীজা। আতঙ্কিত। হঠাৎ শ্রীজা বলল,

—শহরের দিক থেকে একটা গোলমালের আওয়াজ আসছে না? মনে হচ্ছে অনেক লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে।

ভালো করে শুনল সুমিত। সত্যিই তাই।

—কী ব্যাপার বলোতো? সুমিত বলল।

—পরিস্থিতিটা কিন্তু আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না।

—হুঁ।

—এই শহরে আর থাকার দরকার নেই। চলো, লেটস হিট দ্য ফ্রিওয়ে।

কয়েক সেকেন্ড ভাবল সুমিত, তারপর গাড়ির চাবি ঘোরালো। মৃদু গর্জন করে গাড়িটা একটু নড়ে উঠল। ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল,

—প্রায় পুরো ট্যাঙ্ক পেট্রলই আছে। ভাগ্গিস কাল ভরেছিলাম। একবার মেলবোর্নে পৌঁছোতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

শহরের ঠিক মাঝখানে, যেখানে ইনফরমেশন সেন্টারটা আছে, সেখানে গাড়িটা থামাতে হলো। ইনফরমেশন সেন্টারের সামনের পার্কটা লোকে লোকারণ্য। পার্ক ছাপিয়ে লোক উপচে পড়েছে রাস্তায়। রাস্তা বন্ধ। পার্কের মাঝে একটা বেদী, তার ওপর উঠে একটা লোক চিৎকার করে কীসব যেন বলে চলেছে। লোকটার গলা থেকে একটা প্ল্যাকার্ড ঝুলছে, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'। লোকটাকে ঘিরে অনেক লোকজন, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে, কেউ শাপশাপান্ত করছে, কেউ-বা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওদের গাড়িটা দেখে কয়েকজন দৌড়ে এল। তাড়াতাড়ি সুমিত গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

—এই রাস্তাটা কি শহরের বাইরে গেছে? শ্রীজা বলল।

—কী করে বলব? জিপিএস নেই। ম্যাপটাও ছাই কোথায় ফেলেছি।

কিছুদূর যেতেই বোঝা গেল, এটা ভুল রাস্তা। আবার গাড়ি ঘোরালো সুমিত। এই রাস্তাটার মোড়েও অনেক লোকের জটলা। হঠাৎ দুম করে একটা আওয়াজ, চমকে উঠল শ্রীজা।

—পাথর ছুঁড়ছে, পাথর ছুঁড়ছে আমাদের দিকে। ওহ্ ভগবান! চিৎকার করে উঠল শ্রীজা। প্রাণপণে গাড়ি ছোটালো সুমিত। পেছনে তাড়া করে আসছে কয়েকশো উন্মত্ত জনতা। হাতে তাদের পাথর, কোদাল, শাবল, চোখে আদিম হিংস্রতা। এলোপাথাড়ি গাড়ি চালিয়ে শেষমেষ গাড়িটাকে ফ্রিওয়তে এনে ফেলল সুমিত।

—কী হয়েছে ওই লোকগুলোর? আতঙ্কিত শ্রীজা বলল।

—ওরা সব পাগল হয়ে গেছে।

বাঁকের মুখে তীব্র শব্দ করে ব্রেক কষতে হলো সুমিতকে। সামনে রাস্তা জুড়ে শুধু আগুন। বিরাট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। চার-পাঁচটা গাড়ি এদিক ওদিক ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফ্রিওয়ের ওপর, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে সবকটা গাড়িতে। রাস্তা আটকে দিয়েছে আগুন, সামনে এগোনোর উপায় নেই। পেছনেও ফেরার উপায় নেই, সেদিক থেকে গোলমালের আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পাশেই একটা সরু রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে গেছে, সেটার মধ্যেই গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সুমিত। যতটা জোরে পারা যায় গাড়ি চালিয়ে গেল। ভীষণ লাফাচ্ছে গাড়িটা। ধাক্কা লাগছে গাছের ডালে। কছুদুর যেতেই আবার ব্রেক কষতে হলো। সামনে ধোঁয়ার একটা দেওয়াল। আগুন লেগেছে জঙ্গলে। দাবানল! গাড়ি আবার ঘোরালো সুমিত।

—সুমিত! কোত্থেকে আগুন লাগল? একটু আগেও তো...

—নিশ্চয়ই পাগলগুলো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তার ওপর গ্রীষ্মকাল, জঙ্গল খটখটে শুকনো হয়ে আছে।

—এই অবস্থায় আগুন তো দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়বে।

—তাই তো হচ্ছে, দ্যাখো না। যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা এলাম, সেটাও এখন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে।

আগুন, আগুন। জঙ্গলের সর্বত্র আগুন। খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুরের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ওদের গাড়িটা। কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই। মরিয়া সুমিত একটা দিকে আন্দাজ করে আগুনের দেওয়াল ভেদ করেই গাড়িটা চালিয়ে দিল, চোখ বুজে। শ্রীজার দীর্ঘ আর্তচীৎকারের মধ্যেই আগুনের ঘেরাটোপ ঘিরে গাড়িটা বেরিয়ে এল, কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে গাড়িতে। দরজা খুলে এক লাফ দিয়ে নীচে নামল সুমিত, শ্রীজাকেও হ্যাঁচকা টানে নীচে নামালো। ঠিক সেই মুহূর্তেই তীব্র একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে জঙ্গল কেঁপে উঠল। গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে। টুকরো টুকরো হাড়-মাংসের ডেলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীজা আর সুমিতের

দেহদুটো। রেণু রেণু হয়ে উড়ে গেল ওদের সব স্মৃতি, ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন। রেণু হয়ে উড়ে গেল সেও, যে শ্রীজার অজান্তেই গত কয়েক দিন হলো ওর জঠরে বড়ো হয়ে উঠছিল।

ক্যাম্পফায়ারের আগুন ঘিরে আড্ডা বেশ জমে গিয়েছিল। সবাই গল্প করছিল আজকের দিনটা নিয়ে। উইঙ্গান ইনলেট, সমুদ্র, নিরালা বিচ, পাখি। অর্ক শুধু চুপচাপ। নিকোল আড্ডায় যোগ দেয়নি, ওর তাঁবুতে ঢুকে কীসব খুটখাট করছিল। এবার ও বেরিয়ে এল। হাতে একটা পুরনো দিনের মোবাইল ফোনের মতো কিছু, বেশ বড়োসড়ো।

—উইয়ার্ড। স্ট্রেঞ্জ।

কী হলো, তীর্থঙ্কর বলল।

নিকোল : মাই স্যাটেলাইট ফোন ইজ নট ওয়ার্কিং।

তীর্থঙ্কর : রিসেপশন নেই এখানে বোধহয়। মোবাইলেরও তো রিসেপশন পাওয়া যাচ্ছে না।

নিকোল ; হোয়াট স্যাটেলাইট ফোন হ্যাজ টু ডু উইথ রিসেপশন? ইট ওনলি নিডস দ্য স্যাটেলাইটস টু বি দেয়ার ইন দ্য স্কাই। ইভন ডিপ ইন সাহারা ডেজার্ট স্যাটেলাইট ফোন ওয়ার্কস।

তীর্থঙ্কর : তাহলে? কী ব্যাপার?

আদিত্য : কাল থেকে আমাদের কারোর মোবাইল কাজ করছে না। জিপিএস ন্যাভিগেটরটাও খারাপ হয়ে গেল কাল। গাড়ির রেডিয়ো কাজ করছে না। এখন দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইট ফোনও অচল। হচ্ছেটা কী? কেউ কি আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে?

প্রজ্ঞা : আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

আদিত্য : কী?

প্রজ্ঞা : দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো।

তাঁবুতে ঢুকে প্রজ্ঞা স্যুটকেস খুলে পুরোনো দিনের রেডিয়োর মতো দেখতে একটা যন্ত্র নিয়ে এলেন। অন করতেই চুঁইইইইইই আওয়াজ শুরু হলো। কানে হেডফোন লাগিয়ে প্রজ্ঞা কী যেন শুনলেন মন দিয়ে। মাঝে মাঝে যন্ত্রটার ডায়াল ঘোরান, আবার শোনেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। প্রজ্ঞার মুখ ক্রমশ গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। সবাই তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে, উৎকণ্ঠা নিয়ে। শেষে কান থেকে হেডফোন নামালেন প্রজ্ঞা। গম্ভীর স্বরে বললেন,

—গতকাল সন্ধ্যেবেলা নাগাদ একটা সৌরঝড় হয়েছে। বলছে, এতবড়ো সৌরঝড় নাকি গত একশো বছরে হয়নি। বায়ুমণ্ডলের জন্য পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু উপগ্রহ নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে হলেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

নিকোল : দ্যাট ক্লিয়ারস, হোয়াই মাই স্যাটেলাইট ফোন ইজ নট ওয়ার্কিং।

তীর্থঙ্কর : জিপিএস, মোবাইল সব কিছুই এই জন্য চলছে না। মোবাইল ফোনও তো স্যাটেলাইট ব্যবহার করে।

প্রজ্ঞার হাতের যন্ত্রটা দেখিয়ে আত্রেয়ী বলল,

—এটা কী? হ্যাম রেডিয়ো?

প্রজ্ঞা : হ্যাঁ, তুমি জানো দেখছি।

আত্রেয়ী : কোথাও পড়েছিলাম এটার ব্যাপারে। এটা একটা অ্যামেচার রেডিয়ো ট্রান্সমিটার-কাম-রিসিভার। খুব সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটা।

প্রজ্ঞা : হ্যাঁ, খুবই সাধারণ। স্যাটেলাইট যোগাযোগ লাগে না এর জন্য। তাই যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হ্যাম রেডিয়ো ঠিক চালু থাকে। এই হ্যাম নেটওয়ার্কগুলো চালায় শখের রেডিয়ো অপারেটররা, ঘরে বসেই তারা সারা পৃথিবীকে খবর পাঠায়।

আত্রেয়ী : স্যাটেলাইট খরাপ হয়ে গেছে, এছাড়া আর কোনো ক্ষতির খবর পেলেন?

প্রজ্ঞা : হ্যাঁ, দুঃখের কথা, আরও খবর আছে। জিপিএস কাজ না করাতে অনেক প্লেন, অনেক জাহাজ রাস্তা ভুল করে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তার ওপর সারা পৃথিবী জুড়েই নানান জায়গায় অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যেটা ঘটেছে, সেটা হলো, বেশ কিছু ব্যাংকের ডেটা সেন্টার পুরোপুরি বিপর্যস্ত। গুজব রটেছে, কে ব্যাংক থেকে কত টাকা ধার নিয়েছে, আর কত টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছে, সব মুছে গেছে। এছাড়া, সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে পাওয়ার আউটেজ। যেখানে যত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে, সব খারাপ হয়ে গেছে। অন্ধকারে ডুবে আছে সারা পৃথিবী। কবে এসব ঠিক হবে, বলা যাচ্ছে না।

আত্রেয়ী : আর কিছু?

প্রজ্ঞা : আরও আছে। দাঙ্গা শুরু হয়েছে অনেক জায়গায়। লোকজন পাগলের মতো ব্যবহার করছে, রাস্তায় এলোপাথাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে, এমনকী দোকানপাট লুঠ করছে।

আদিত্য : দাঙ্গা শুরু হয়েছে! কেন?

প্রজ্ঞা : ঠিক জানি না, তবে আমার একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে। সেটা বলতে পারি।

আদিত্য : কী সেটা?

প্রজ্ঞা : তোমরা জানো কিনা জানি না, একটা মানসিক অসুখ

আমাদের অজান্তেই সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় সবসময় কিছু লোককে দেখবে, যারা সর্বক্ষণ নিজের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আঠার মতো আটকে আছে। যদি পনেরো মিনিট কোনো ফোন না আসে, মেসেজ না আসে, তাহলেই এরা পাগল পাগল ভাব করতে থাকে। বারবার চেক করে, মোবাইলটা খারাপ হয়ে যায়নি তো? লক্ষ্য করলে দেখবে, এরকম লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। এরা সবাই একরকমের নেশাগ্রস্ত। মোবাইলের নেশা, তার মাধ্যমে সবার সঙ্গে যুক্ত থাকার নেশা। সবসময় এদের ভয়, এরা একলা না পড়ে যায়। এদের থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে দেখা গেছে, নেশার ওষুধ না পেলে ড্রাগ অ্যাডিক্টরা যেরকম করে, এরাও ঠিক সেরকমই পাগলামো শুরু করে।

সুনন্দ : ইমপালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার।

প্রজ্ঞা : ঠিক তাই। গতকাল থেকে সারা পৃথিবীর সব মোবাইল নেটওয়ার্ক খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এইসব মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকগুলোর কী হাল হয়েছে গত চব্বিশ ঘণ্টায়, ভেবে দেখেছ? যদি পৃথিবীর জনসংখ্যার এক শতাংশও এরকম ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তো হয়েই গেল। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, কিছু লোকের ‘প্রলয় আসছে’ এই অন্ধবিশ্বাস। ‘প্রলয় হবে’ ‘প্রলয় হবে’ এই ভয়েই লোকে প্রলয় আরও বেশি করে ডেকে আনল। যেই দেখছে চব্বিশ ঘণ্টা ইলেক্ট্রিসিটি নেই, মোবাইল নেই, কিছু লোক রাস্তাঘাটে পাগলামো করছে, অমনি তারা ভেবে নিয়েছে, প্রলয় এসে গেছে।

আত্রেয়ী : কী হবে এখন?

প্রজ্ঞা : চিন্তা করো না। মানুষ হিমযুগের মধ্য দিয়েও বেঁচে বেরিয়েছিল। সুপার-ভলক্যানোর অগ্ন্যুৎপাতে সারা পৃথিবী যখন ছাইয়ে ঢেকে গেছিল, তখনও কুড়ি হাজার মানবসন্তান টিকে গেছিল। আমরা সবাই তাদের বংশধর। সেসবের তুলনায় এবার তো কিছুই ঘটেনি। সম্ভবত দুশো বছর আগেও একবার এরকম মারাত্মক সৌরঝড় হয়েছিল। বারে বারেই হয়। প্রতিবারের মতো এবারও পৃথিবী মা আমাদেরকে তাঁর আঁচলের আড়াল দিয়ে রক্ষা করেছেন। কদিন আগে কোভিড অতিমারী হলো, সবাই ভেবেছিল মানব সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে। সেটা হলো কি? প্রকৃতি মা আমাদের ধারালো নখ দেননি, শিং দেননি, ওড়বার মতো ডানা দেননি। কিন্তু একটা জিনিস ভরপুর দিয়েছেন, সেটা হলো বেঁচে থাকার মতো, টিকে থাকার মতো বুদ্ধি।

একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনে সবাই চমকে উঠল। অনেক দূরে কোথাও হইচই হচ্ছে, জঙ্গলে অসংখ্য জন্তুজানোয়ারের দৌড়োদৌড়ির আওয়াজ আর আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আতঙ্কিত সবাই, এগিয়ে গিয়ে দেখল, দূরে জঙ্গলে আগুন লেগেছে। পুব, পশ্চিম, উত্তর সবদিকের আকাশই লাল। চিৎকার করে উঠল অর্ক, ‘‘তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো সবাই।’’

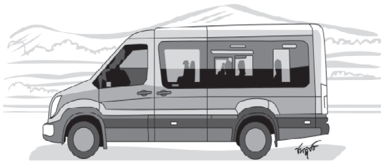

রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে জ্বলন্ত টায়ার আর গাছের গুঁড়ি। দ্রুত হাতে স্টিয়ারিঙে মোচড় দিয়ে গাড়ি উলটো দিকে ঘোরালো সুনন্দ। একটু এগোতেই দেখল, রাস্তাজুড়ে পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়ে শ’ পাঁচেক লোক। হাতে তাদের লাঠি, উন্মত্ত চাউনি দেখে ভয়ে গা হিম হয়ে গেল সবার। দেখতে দেখতে সেই উন্মত্ত জনতা ঘিরে ধরল গাড়িটাকে। দুম দুম দুম দুম করে চাপড় দিতে লাগল গাড়িটার গায়ে। চিৎকার, হইহুল্লোড়ের

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable,
PVC Tape, Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

মধ্যে একটা লোক মশাল হাতে এগিয়ে এল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, গাড়িতে আগুন লাগানো। ডুকরে কেঁদে উঠল আত্রেয়ী। ঠিক এই সময় সরররররর শব্দে চমকে উঠলো সবাই। দেখল, ডান হাতের আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় গাড়ির ছাদের কাঁচের জানালাটা খুলে ফেলেছে অর্ক।

''কী করছিস!'' চাপা গলায় বলল সুনন্দ।

কোনো উত্তর না দিয়ে, সবাইকে চমকে দিয়ে পরপর দ্রুত কয়েকটা কাজ করে ফেলল অর্ক। ক্লিক শব্দে সিটবেল্ট খুলে ফেলল, জ্যাকেটটা একটানে খুলে ফেলে দিল। পরমুহূর্তে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠে দাঁড়ালো। আরেকটা লাফে গাড়ির ছাদের জানালা গলে বেরিয়ে এল, উঠে দাঁড়ালো ছাদের মাথায়। শূন্যে লাফ দিয়ে প্রায় দশ ফুট ভেসে গিয়ে পড়ল সেই লোকটার মাথায়, যে গাড়িতে আগুন লাগাতে আসছিল। এক আছাড় মেরে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল অর্ক। সেখান থেকে আরেকটা লাফে পরের লোকটার মাথার উপর উড়ে গিয়ে পড়ল অর্ক। সেই লোকটাও ভূমিশয্যা নিল। সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল অর্কর ডানহাত। আকাশ থেকে লৌহমুষ্টির উপর্যুপরি বর্ষণে একের পর এক উন্মত্ত জনতা লুটিয়ে পড়তে লাগলো মাটিতে। লাফের পর লাফ দিয়ে লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে অর্ক, কেউ ওকে ধরতে পারছে না।

''তেমির মুষ্ট! তেমির মুষ্ট!'' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন প্রজ্ঞা।

আগ্রাসী জনতা থমকে দাঁড়িয়েছে। অর্ক কিন্তু বিনা বিরামে একের পর এক লাফে শত্রু সংহার করে চলেছে। এরই ফাঁকে চেঁচিয়ে সুনন্দকে বলল, ''হ্যাঁ করে দেখছিস কী। গাড়ি চালিয়ে পালা এখান থেকে।''

''আর তুই?'' কাঁপা গলায় প্রশ্ন সুনন্দর।

''পাগলামি করিস না। তোর সঙ্গে বাচ্চারা আছে, ওদের আগে বাঁচা। এই লোকগুলোর একটা ব্যবস্থা করে আমি ঠিক মেলবোর্নে পৌঁছে যাব।''

পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে দিল সুনন্দ। পেছনে পড়ে রইল একের পর এক বিধ্বস্ত জনপদ। দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ।

''বিশ্বত্রাস তেমির মুষ্ট....তোমার ছোটোবেলার বন্ধু?'' ফিসফিস করে সুনন্দকে বললেন প্রজ্ঞা, ''লোকটার সঙ্গে আমারা সবাই এতগুলো দিন কাটালাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।''

সেই শেষ দেখা অর্কর সঙ্গে। এরপর প্রায় ছ' মাস কেটে গেছে। কোভিডের অতিমারী সামলে পৃথিবী স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিল, হালের এই পৃথিবীব্যাপী দুর্ঘটনা থেকেও একটু একটু করে সেরে উঠছে মানবজাতি। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুনন্দর কাজের চাপ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। এখন এমনকী রবিবারও হাসপাতালে দৌড়াতে হয়। কেউ পাগল হয়ে মারপিট করছে, কেউ-বা হতাশায় আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। রুগি আসার আর অন্ত নেই।

রবিবারের সকাল। বসার ঘরে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল সুনন্দ। টিং করে শব্দ হলো ওর মোবাইলে। কে এই সকালে মেসেজ করল? একটু পরেই হাসপাতালের জন্য বেরোতে হবে, তার আগে এক কাপ কফিও কি শান্তিতে খেতে দেবে না কেউ? ফোনটা হাতে তুলে দেখল, অজ্ঞাত একটা নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে। বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করল সুনন্দ। এই এক যন্ত্রণা হয়েছে আজকাল। ভুলভাল নম্বর থেকে মেসেজ আসে। সঙ্গে একটা লিংক থাকে। সেই লিংকে ক্লিক করলেই হ্যাকাররা মোবাইল হ্যাক করে নেয়। মানুষের জীবনে এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর এই হ্যাকারদের উৎপাত। না দেখেই মেসেজটা ডিলিট করতে যাচ্ছিল সুনন্দ, কী মনে হওয়াতে সেটা না করে মেসেজটা খুলে দেখল।

না, কোনো লিংক নেই ওটাতে। সোজাসাপটা বাংলা হরফে কয়েকটা কথা লেখা আছে।

কেমন আছিস ভাই? তোর সঙ্গে কয়েকটা দিন খুব ভালো কাটলো। তুই আমার অনেক খাতির যত্ন করেছিস। তার বদলে তোকে আমি একরাশ ধাঁধার মাঝে ঝুলিয়ে রেখে কেটে পড়েছি। খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি কী করব বল? অর্কর উত্তাপে কুয়াশা দূর হয়। আমি এমনি এক অর্ক, যার গোটা জীবন পথটাই গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা। ভালো থাকিস ভাই।

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো মোবাইলে। তার সঙ্গেই, নিজে থেকেই মেসেজটা ডিলিট হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ না দিয়ে।

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

With Best Compliments From-

S. K. KAMANI

'পক্ষধরের পক্ষ ধরেই পক্ষশাতন' এক চোখেতেই মিথিলা জয়

নন্দলাল ভট্টাচার্য

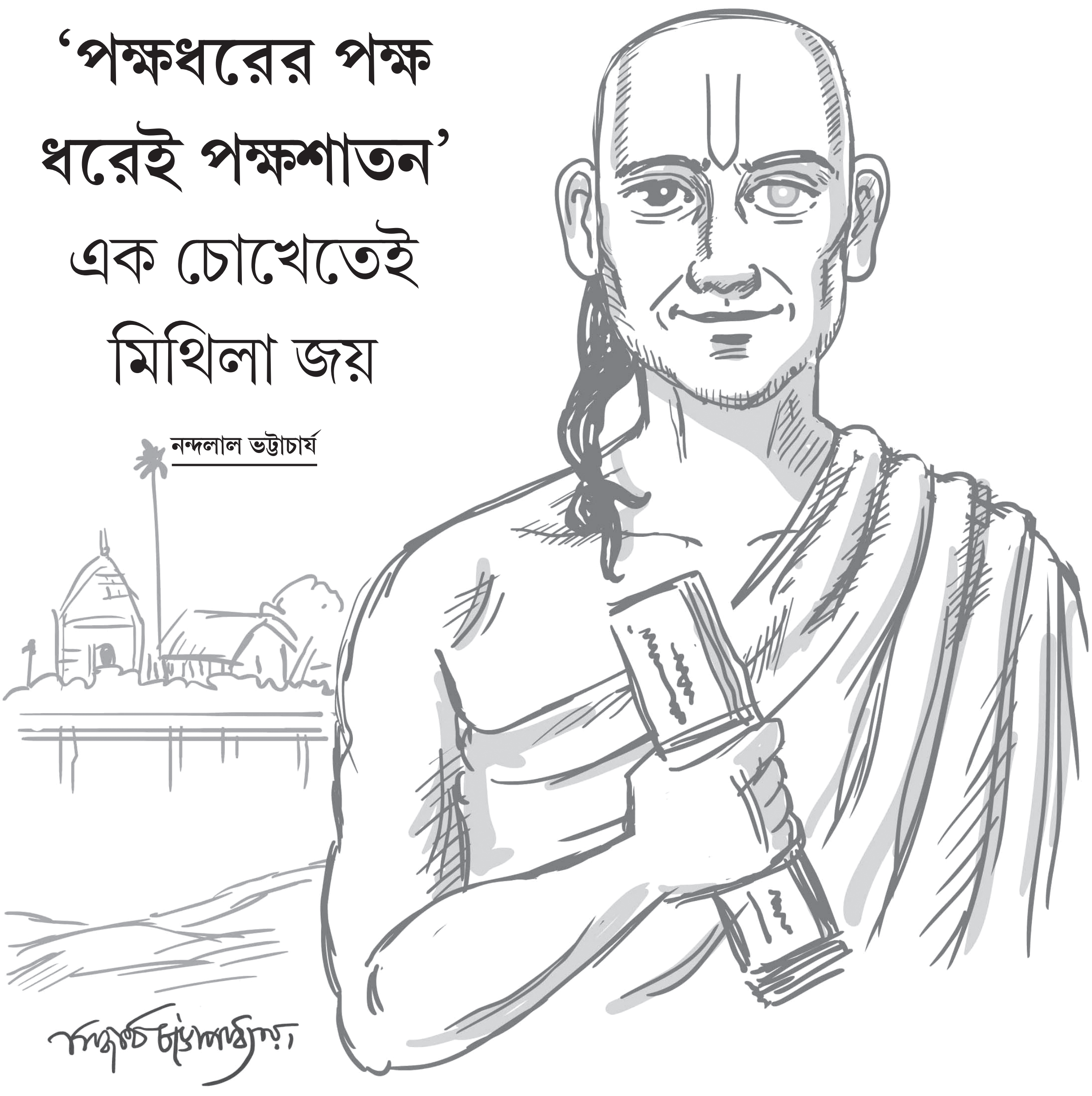

দুই বন্ধু

নিমাই তখনও শ্রীচৈতন্য হননি। তখনও হননি টোলের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত। তখনও তিনি নন নবদ্বীপের তথা দেশের প্রদীপ্ত সূর্য। তখনও তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের টোলের একজন ছাত্র মাত্র। তবে এটা সত্য, পুবের আকাশ ক্রমেই অরুণোদয়ের বিভায় রক্তিম।

সংস্কৃত টোলের এটা রীতি। একই সঙ্গে নানা বয়সের ছাত্র পাঠ নেয় বিভিন্ন বিষয়ে। সার্বভৌমের টোলেও হতো তাই। অন্যান্যদের সঙ্গে সেখানে পড়তেন এক ছাত্র। নাম তার রঘুনাথ। অসম্ভব ধী-শক্তির অধিকারী রঘুনাথ। তাই কেবল ছাত্রদের কাছে নয় ,অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌমেরও অত্যন্ত প্রিয় ওই রঘুনাথ।

রঘুনাথ বুদ্ধিমান। মনোযোগী ছাত্র। একটা চোখ কিন্তু তার খারাপ। শৈশবে পোকার কামড়ে চোখটা নষ্ট হয়েছে তার। কানা বলে প্রথম প্রথম কেউ কেউ তাকে নিয়ে মজাও করত। কিন্তু তার প্রতিভার আগুনে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপই ক্রমে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

টোলে সেই রঘুনাথের সঙ্গেই নিমাইয়ের সবচেয়ে বেশি ভাব। সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা। বয়সে রঘুনাথ নিমাইয়ের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো। তবুও সমবয়সিদের চেয়ে রঘুনাথের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশি ঘনিষ্ঠতা। পড়াশোনার যে কোনো বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেই রঘুনাথ আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশি।

নিমাই অত্যন্ত প্রতিভাবান। নিমাই আবার রীতিমতো রসিক। রঙ্গরসিকতায় ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গেই মজা করত নিমাই। উত্ত্যক্ত করত। কিন্তু আশ্চর্য, রঘুনাথকে নিয়ে নিমাই কখনই কোনো রসিকতা করত না। আর সেটা রঘুনাথের মেধার কারণেই। নিজের পাঠ্য নিয়ে তো বটেই, অন্যান্য যে কোনো বিষয় নিয়েই অনায়াসে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতো রঘুনাথ। আর সেটাই ছিল তার প্রতি নিমাইয়ের আকর্ষণের মূল কারণ।

সেদিন একটু দেরিতে টোলে এসেছিল নিমাই। এসে কিন্তু রঘুনাথের দেখা পেল না। শুনল, রঘুনাথ যথারীতি এসেছিল টোলে। পড়াশোনার পর চলে গেছে সে।

এমনটা মাঝে মধ্যেই হয়। তাই নিমাই তেমন গুরুত্ব দেয় না বিষয়টায়। কিন্তু পরদিনও রঘুনাথকে দেখতে না পেয়ে একটু বিচলিতই হয়। তার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ে নিমাই।

এদিক-ওদিক খুঁজেও রঘুনাথকে না পেয়ে গঙ্গাস্নানে যায়। স্নান সেরে একটু ঘুরপথেই বাড়ি রওনা হয় নিমাই।

আর সেই পথেই দেখে রঘুনাথকে। নগরের বাইরের বনে একটি গাছের তলায় চুপচাপ বসে আছে রঘুনাথ। কোনো দিকে হুঁশ নেই তার। যেন ধ্যানমগ্ন।

এগিয়ে যায় নিমাই। ডাকে রঘুনাথকে। কিন্তু সাড়া পায় না। নিমাই দেখে, রঘুনাথের সারাগায়ে লেগে রয়েছে পাখির বিষ্ঠা। অথচ রঘুনাথ নির্বিকার। কিছু বুঝতে পারে না নিমাই। আরও বারকয়েক ডাকার পর নিমাই কমণ্ডলুর জলটা ঢেলে দেয় রঘুনাথের মাথায়।

জলের স্পর্শে ধ্যান ভাঙে রঘুনাথের। চোখ মেলে তাকায় সে। নিমাই জানতে চায়, কী হয়েছে তার?

রঘুনাথ একটু জড়ানো গলায় বলে, কিছু না।

—কিছু না। হতেই পারে না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। সেটা আমাকে বলছ না কেন?

—বলছি তো, কিছু হয়নি।

—দেখ, যা হয়েছে আমাকে বলতে পারো। আমি হয়তো তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারি।

—না নিমাই। এ বড়ো কঠিন সমস্যা। বললেও তুমি এর সমাধান করতে পারবে না।

—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবুও বলো। একবার চেষ্টা করে দেখি।

—শোনো তবে। পণ্ডিতমশাই পড়াতে পড়াতে হঠাৎ-ই একটা প্রসঙ্গ তুলে আমাকে উত্তরটা দিতে বলেন। তখন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি। তাই নগরের বাইরে এই গাছতলায় বসে কেবলই ভাবছি। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে আমার তা খেয়ালই নেই। ঠিক করেছি, উত্তরটা না পাওয়া পর্যন্ত এই গাছতলাতে বসেই ভাবব। তাই বলছি নিমাই তুমি ঘরে যাও। আমিও চিন্তা করে যাই।

নিমাই বলে, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছো তুমি, সাধনায় কী না হয়। তবে একটা কথা, যেটা তোমাকে এমন ভাবাচ্ছে সেটা জানতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে। বলো না তোমার সমস্যাটা?

নিমাইয়ের এ অনুরোধ এড়াতে পারে না রঘুনাথ। তাই অনিচ্ছার সঙ্গেই বলে সব কথা।

শুনে নিমাই একটু ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা উত্তরটা এই হবে না তো।

উত্তরটা শুনেই রঘুনাথ বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই তো উত্তর হবে। এতক্ষণ চেষ্টা করেও আমি যেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কী মূর্খ আমি। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে রঘুনাথ, তোমাকে কথাটা প্রথমেই না বলে আমি মহা অন্যায় করেছি। নিমাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি বুঝতে পারছি তুমি কোনো সাধারণ মানুষ নও। তুমি দেবতা। আবারও বলছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

নিমাই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রঘুনাথকে। বলে এ কী বলছ তুমি। এসব তোমারও জানা। এই মুহূর্তে হয়তো মনে পড়ছিল না তোমার। এমন তো হয়ই, এখন চলো, স্নান করে বাড়িতে চলো। তারপর দুজনে মিলে যাবো টোলে। দুজনেই এবার গঙ্গাপথগামী।

যত দিন যায়, নিমাইয়ের সঙ্গে রঘুনাথের সম্পর্কটা ততই যেন গাঢ় হয়। মাঝেমাঝে ভাবে রঘুনাথ, প্রথমটা কী ভুলই না করেছিল সে। বয়সে বড়ো, বাসুদেব সার্বভৌমের টোলেও পড়ছে নিমাইয়ের বেশ কিছু আগে থেকেই। তাই রঘুনাথের মনে একধরনের অহমিকা দানা বাঁধছিল তখন। নিমাইকে তেমন পাত্তা দিত না রঘুনাথ। কিন্তু যত দিন যায়, নিমাইয়ের প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখে বিস্মিত হতে থাকে রঘুনাথ। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, দীপশিখা যেমন আকর্ষণ করে পতঙ্গকে, সেইরকম একটা তীব্র অনুরাগে রঞ্জিত হতে থাকে রঘুনাথের মন। দিবা-রাত্র নিমাইয়ের সঙ্গে আশ্লিষ্ট থাকতে চায় তার অন্তর। সত্যি কথা বলতে কী,অধ্যাপকের পাঠের চেয়েও নিমাইয়ের সঙ্গে আলোচনাতেই ঋদ্ধ হয় রঘুনাথ।

সার্বভৌমের টোলে রঘুনাথ তখন নিচ্ছিলেন ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ। নিমাইও শুরু করেছিল ন্যায়ের চর্চা। পাঠগ্রহণের সময়ই আচার্য বাসুদেবের সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারত না রঘুনাথ। প্রতিদিন সার্বভৌমের কাছে যে পাঠ নিত, রাতে সেগুলিই ভালো করে লিখে রাখত। আর তখনই আচার্যের সিদ্ধান্তের মধ্যে কেমন যেন একটা ফাঁক খুঁজে পেত রঘুনাথ।

পরদিন সবিনয়েই অধ্যাপককে জানাত তার সংশয়ের কথা।

সে সংশয় যে অকারণে নয়, তা বুঝতে পারতেন বাসুদেব। কিন্তু ছাত্রের কাছে হার মানতে চাইত না মন। তাই বাকচাতুর্যে রঘুনাথকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন তিনি। অধ্যাপকের এই মানসিকতা রঘুনাথের কাছে অধরা থাকে না। তাই কোনো কথা না বলে রঘুনাথ নিজেই ন্যায়ের একটা টীকা লিখতে থাকে।

নিমাই গঙ্গায় ভাসান গ্রন্থ

লিখতে লিখতে রঘুনাথ ভাবে, তার ওই ন্যায়ের টীকাই হবে সবার সেরা। ভবিষ্যতে এই টীকাই সারাদেশে মান্যতা পাবে। এই টীকার সমতুল আর কেউ লিখতে পারবে না। এই অহমিকা রঘুনাথকে এক ধরনের আনন্দ দেয়। তবে রঘুনাথ সেই ছেলেবেলা থেকেই নিয়মনিষ্ঠ, সংযমীও। সেই সংযমই অহমিকা প্রকাশে তাকে বিরত রাখে।

রঘুনাথ যেসময়, যে উদ্দেশ্যে ন্যায়ের ওই টীকা লিখছিল, নিমাইও ঠিক ওইসময়ই রচনা করে ন্যায়ের ওপর টীকা। প্রথমটায় রঘুনাথ বা নিমাই কেউই জানত না পরস্পরের এই একই বিষয়ে লেখালেখির কথা।

হঠাৎই একদিন রঘুনাথের কানে আসে নিমাই ওই একই বিষয়ে লিখছে একটি টীকা। কথাটা শুনেই রঘুনাথ যেন বজ্রাহত। রঘুনাথ নিশ্চিত, নিমাইয়ের টীকা তার চেয়ে অনেক বেশি সরস এবং যুক্তিনিষ্ঠ হবে। না পড়েই রঘুনাথ সিদ্ধান্তে আসে, তার আর ভারতসেরা হওয়া হবে না। কেউ পড়বে না তার গ্রন্থ।

চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ার আগে রঘুনাথের মনে হয়, নিমাইয়ের পুঁথিটা একবার পড়া দরকার। বলা তো যায় না, তারটাই হয়তো শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাবে। এই আশাতেই রঘুনাথ একদিন বলে, ভাই নিমাই, ন্যায়ের ওপর তুমি একটা টীকা লিখেছ শুনলাম। আমাকে একবার শোনাবে তোমার পুথি।

নিমাই সরল মনেই বলে, কেন শোনাব না, নিশ্চয় শোনাব। গঙ্গা পারাপারের সময় নৌকাতেই তোমাকে শোনাব আমার পুথি।

গঙ্গার বুকে মন্দমধুর ছন্দে ভেসে চলেছে নৌকা। নিমাই গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করে চলেছে পুথি। নিবিষ্ট মনে তা শুনছে রঘুনাথ। শুনতে শুনতে কেমন যেন ধিক্কার জাগে নিজের প্রতি। চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। একসময় কান্না আর চেপে রাখতে পারে না রঘুনাথ। চাদরে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কান্নার আওয়াজেই থমকে যায় নিমাই। বন্ধ করে পাঠ। উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কাঁদছ কেন তুমি? শরীর খারাপ লাগছে? তাহলে নৌকা ভিড়াতে বলি পাড়ে।

এ কথায় রঘুনাথ আরও জোরে কেঁদে ওঠে। নিমাই তার পিঠে হাত রেখে বলে কী হয়েছে তোমার? আমায় বলো—

কোনোরকমে কান্না চাপে রঘুনাথ। বলে, না শরীর খারাপ করেনি। কান্না এসেছিল তোমার পুথি শুনতে শুনতে।

এই নীরস ন্যায়ের পুথি শুনে কান্না পেল তোমার? নাটক হলে না হয় মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ন্যায়ের টীকা শুনে বা পড়ে কেউ কোথাও কেঁদেছে এমন কথা তো শুনিনি কোথাও।

রঘুনাথ বলে, ভাই তুমি শুনেছো বোধহয়, আমি ন্যায়ের ওপর লিখেছি একটা পুথি। মনে বাসনা ছিল আমার পুথি হবে দেশের সেরা। সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠবে আমার নামে। কিন্তু আজ তোমার এই পুথি শোনার পর বুঝলাম, শূন্যে প্রাসাদ বানিয়েছিলাম আমি। দু'পাতা লিখেও যে বিষয়টা ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি, তুমি মাত্র দুই পঙ্‌ক্তিতে তা বুঝিয়েছো অত্যন্ত সহজসরল ভাবে। এ পুথি থাকতে কেউ পড়বে না আমার পুথি।

কান্নার কারণটা শুনেই হো-হো করে হেসে ওঠে নিমাই। তাকে এমনভাবে হাসতে দেখে কান্না ভুলে রঘুনাথ প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে, তুমি হাসছ! আমার সব আশা নিরাশায় পরিণত হয়ে গেল শুনেও তুমি হাসছ? এতটা নিষ্ঠুর, এতটা হৃদয়হীন তুমি।

রঘুনাথের কথায় হাসি থামায় নিমাই। তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলে, তোমার সব আশা, সব পরিশ্রম জলে গেল এটাই তো তোমার কথা। বেশ তবে সেটা জলেই যাক।

কী বলছ তুমি? আমাকে ব্যঙ্গ করছ তুমি? আমার সব পরিশ্রম জলে যাবে?

হ্যাঁ, জলেই যাবে। তবে তোমার নয়, আমার। বলতে বলতে নিমাই তার নিজের পুঁথিটা ভাসিয়ে দেয় ভাগীরথীর জলে।

নিমাইকে পুথি ভাসিয়ে দিতে দেখে রঘুনাথ হা-হা করে ওঠে। বলে, কী করছ—কী করছ তুমি!

তোমার কান্নার মূল কারণকেই ভাসিয়ে দিলাম, এবার তো নিশ্চিন্ত তুমি। এবার রইল কেবল তোমার লেখা ন্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকবে তুমি চিরকাল।

নিমাই!

কোনো কথা নয়, এবার হাসো—-হাসো বলছি।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না। আরও জোড়ে কেঁদে ওঠে রঘুনাথ। নিমাই,এবার বুঝতে পারলাম, তুমি সত্যিই মানুষ নও, তুমি দেবতা।

নিমাই একইভাবে বলে, বাদ দাও ওসব কথা। এবার নৌকা ভিড়ুক কূলে। চল যাই যে যার বাড়ি।

রঘুনাথের লেখা ওই পুথিটাই হলো নব্য ন্যায়শাস্ত্রের সেই বিখ্যাত গ্রন্থ—দীধিতি। রঘুনাথের প্রথম গ্রন্থ।

বঙ্গে নব্যন্যায়ের অগ্রপথিক

বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়চর্চার অন্যতম অগ্রপথিক তিনি। নাম তাঁর রঘুনাথ শিরোমণি। পঞ্চদশ শতকে জন্ম। মোটামুটিভাবে তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যর প্রায় সমসাময়িক। একটা সময়ে তাঁরা ছিলেন প্রায় হরিহর আত্মা। তবে কতদিন তাঁদের মধ্যে এই সখ্য ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বলা যায় না রঘুনাথের সঠিক জন্মসাল অথবা জন্মস্থানের কথা। অনেক কিংবদন্তী, অনেক অতিকথন, অনেক জানা অজানা কাহিনি রয়েছে তাঁকে ঘিরে।

একটা তথ্য বলছে রঘুনাথের জন্ম ১৩৯৯ শকাব্দে বা ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এই তথ্য অনুযায়ী রঘুনাথ ছিলেন নিমাই বা শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো।

কেউ কেউ নস্যাৎ করেছেন এই তথ্যকে। বলেছেন, শ্রীচৈতন্যর জন্মের সময় রঘুনাথ ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। সেক্ষেত্রে তাঁর জন্ম সাল হয় কমকরে ১৪৬৪ বা আরও কিছু আগে।

রঘুনাথের জন্মস্থান নিয়েও আছে কিছু বিতর্ক। কারও মতে জন্ম তাঁর শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে। বাবা সুদ্ধিদীপিকা-র 'দীপক প্রভা' টীকার রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্তী। মা সীতা দেবী। রঘুনাথের বয়স যখন বছর তিন-চার, সেইসময় মারা যান তাঁর বাবা। ছোট্ট রঘুনাথকে নিয়ে সীতাদেবী চলে আসেন নবদ্বীপে।

নবদ্বীপে সেইসময় বাস করতেন শ্রীহট্টের বহু মানুষ। বস্তুত, নবদ্বীপে ছিল তাঁদের একটা পৃথক বাসস্থান। তাঁদের ভরসাতে সীতা দেবী নাকি নবদ্বীপে এসেছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে অবস্থা যে ফিরেছিল তা বলা যায় না। তাদের দেখা দিয়েছিল চরম দারিদ্র্য। দু'বেলা কেন একবেলার খাবার সংস্থান করাই ছিল মহাসমস্যা। ফলে রঘুনাথের বয়স যখন পাঁচ বছর সেসময়ে তাঁকে কোনো টোলে ভর্তি করাটা ছিল প্রায় দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রঘুনাথের শিক্ষার রাস্তাটি খুলে যায়।

নবদ্বীপ ছিল সে সময় বর্তমান কলকাতার চেয়েও অনেক বেশি ঐশ্বর্যে ভরা। সেন রাজত্বের সময় নবদ্বীপ ছিল বঙ্গের রাজধানী। একই সঙ্গে নবদ্বীপ ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। অসংখ্য টোল ছিল নবদ্বীপে। ছিলেন দেশের তাবড় তাবড় পণ্ডিত। নানা শাখায় তাঁরা ছিলেন সুপণ্ডিত। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আসত নবদ্বীপে। অন্যদিকে নবদ্বীপে ছিল অসংখ্য মন্দির। দিবা-রাত্র শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি, স্তোত্র আর কীর্তনের সুরে আকাশ-বাতাস হতো রণিত।

নবদ্বীপের অধ্যাপকরা প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম। প্রত্যেকেই ছিলেন বিদ্যাধনে ধনী। দেবী সরস্বতীর নিত্য আশীর্বাদ বর্ষিত হতো অধ্যাপকদের ওপর। কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই। গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন তেমনই একজন মানুষ।

শ্রীহট্ট থেকে তিনি এসেছিলেন নবদ্বীপে। কিন্তু তাঁর আর্থিক ভাগ্য ছিল অত্যন্ত খারাপ। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। রঘুনাথের যখন বছর তিন বয়স, সেইসময় হঠাৎ-ই মারা যান গোবিন্দ চক্রবর্তী। পরিবারটি এবার সত্যিই পড়ল অথই জলে। অথবা বলা যায় তপ্তকড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়ল পরিবারটি। অন্নের সংস্থান করা হয়ে দাঁড়াল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সীতাদেবী শিশু রঘুনাথকে বাঁচানোর জন্য শেষে ভিক্ষা শুরু করলেন। কিন্তু ক্রমে ভিক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠল। তাই বাধ্য হয়েই সীতাদেবী টোলের ছাত্রদের 'পেটেলী' (মূল শব্দ পাটিয়ালী, যার অর্থ কৃতকর্মা) অর্থাৎ দাসিগিরি করতে থাকেন। আর তাতেই কোনোরকমে দিন চলে যায় তাদের।

দুবেলা খাবারের একটু সংস্থান হলেও রঘুনাথকে টোলে পড়াবার কথা ভাবতে পারেন না সীতাদেবী। অথচ বাসনা, ছেলে তাঁর হোক মহাপণ্ডিত, দেশের গৌরব। কিন্তু তার হাতেখড়িই দিতে পারলেন না, সে কীভাবে টোলে ভর্তি হবে বা পড়াশোনা করবে? সত্যি, দিনে নক্ষত্র দেখছেন না তো সীতাদেবী!

হাতই হলো অগ্নিপাত্র

সেদিন উনুন জ্বালতে গিয়ে সীতাদেবী দেখেন আগুন নেই। আগুন আনার জন্য তিনি রঘুনাথকে ডাকলেন। বলেন, যাও তো বাবা, টোলের ওদের কাছ থেকে একটু আগুন নিয়ে এসো তো।

যাই মা বলেই রঘুনাথ ছোটে টোলের দিকে। আজ হয়তো এই আগুন আনা কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগবে। মনে রাখা দরকার, সেই পঞ্চদশ শতকে আজকের মতো দেশলাই ছিল না। আগুন জ্বালানোর জন্য তখন নির্ভর করতে হতো চকমকি পাথরের ওপর। কিন্তু সবসময় চকমকি কাজে লাগতো না। তাই সকলেই সবসময়ের জন্য আগুন জ্বেলে রাখতো। সেই অর্থে তখন প্রায় প্রতিটি বাড়িই ছিল সাগ্নিক। নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর মতো মানুষ ঘরে আগুনও মজুত রাখতো। কখনও যদি সে আগুন নিভে যেত, তাহলে প্রতিবেশীদের কারো কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে আসা হতো। সেই রীতিতেই সীতাদেবী আগুন আনার জন্য রঘুনাথকে টোলে পাঠান।

মায়ের কথা ছিল রঘুনাথের কাছে বেদবাক্য। মায়ের নির্দেশ পালন করার জন্য রঘুনাথ সবসময় তৎপর থাকতো। সেদিনও তাই মা বলা মাত্র রঘুনাথ ছোটে টোলে আগুন আনার জন্য।

টোলের ছাত্ররা তখন ব্যস্ত যে যার কাজে। রঘুনাথের সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। সে হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে বলে বাড়িতে আগুন নিভে গেছে। আমাকে তাড়াতাড়ি একটু আগুন দাও।

প্রথমটায় কেউ তার কথায় কান দেয় না। কিন্তু রঘুনাথ একই কথা বলতে থাকায়, একটু বিরক্ত হয়েই একজন হাতায় করে খানিকটা আগুন নিয়ে এসে বলে, নে ধর তোর আগুন।

আগুন নিতে গিয়ে থমকে যায় রঘুনাথ। তাই তো, তাড়াহুড়োয় আগুন নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো পাত্র আনতে ভুলে গেছে সে। এখন কী হবে? রঘুনাথ চুপচাপ ভাবছে। ওদিকে হাতায় আগুন নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত ছাত্রটি বলে, কী হলো, দাঁড়িয়ে আছিস যে। এতক্ষণ তো আগুন, আগুন বলে চিৎকার করে কানের মাথা খাচ্ছিলি। এখন আগুনটা নিয়ে বিদেয় হ' এখান থেকে।

মুহূর্তের চিন্তা। তারপরই রঘুনাথ দু'হাত ভরে তুলে নেয় রাস্তার ধুলোবালি। তারপর বলে, দাও আমার হাতে আগুনটা দাও।

রঘুনাথের বয়স তখন পাঁচও পার হয়নি। অতটুকু ছেলের অমন বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন টোলের অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি বুঝতে পারন, ঠিকমতো পড়াশোনা করলে এ ছেলে ভবিষ্যতে একজন মহাপণ্ডিত হবে।

বাসুদেব খোঁজ নিয়ে জানলেন, ছেলেটির নাম রঘুনাথ। যে মহিলা ছেলেদের ঘরদোর গোছানো থেকে সব কাজ করে দেয়, এ তারই ছেলে। পিতৃহারা ছেলেটির যে এখনও হাতেখড়ি হয়নি সে কথাও শোনেন তিনি। তারপরই সিদ্ধান্ত নেন, ছেলেটিকে তিনি টোলে ভর্তি করে নেবেন। তিনিই পড়াবেন ওকে।

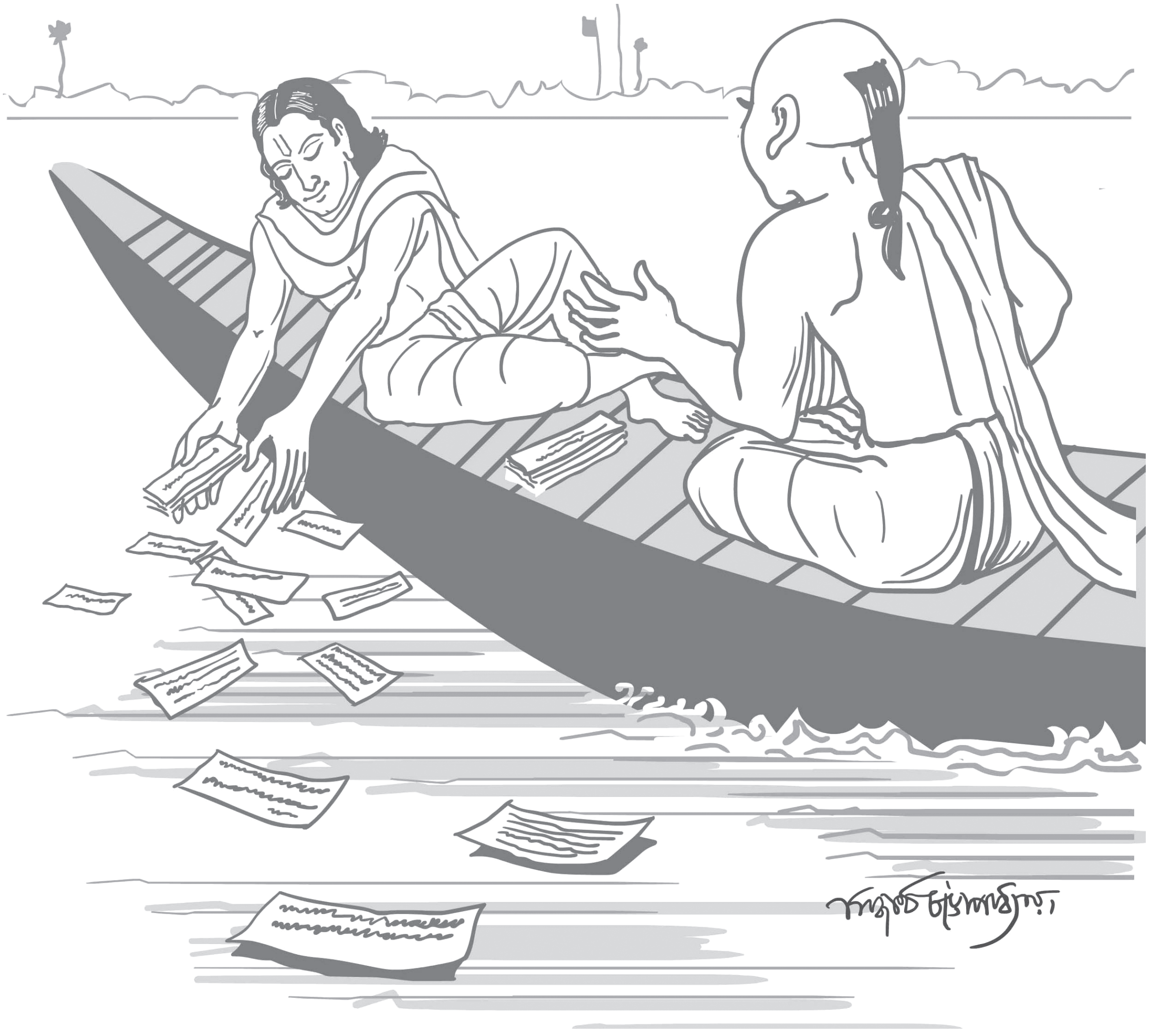

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এক মুহূর্ত দেরি করেন না বাসুদেব। তিনি সোজা চলে যান তাদের বাড়ি। পণ্ডিতমশাইকে বাড়িতে আসতে দেখে সীতাদেবী মহাব্যস্ত। এমন মানী মানুষকে কোথায় বসতে দেবেন বুঝতে পারেন না।

সীতাদেবীর ব্যস্ততা দেখে বাসুদেব বলেন, এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এখন বসা হবে না আমার।

আমি এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে।

—প্রস্তাব!

—তোমার এই ছেলেটি আমাকে দাও। আমার টোলে ও পড়াশোনা করবে। ভারী বুদ্ধিমান তোমার ছেলে। দেখো, কালে ও একজন মানুষের মতো মানুষ হবে।

বাসুদেব সার্বভৌমের ওই কথায় সীতাদেবী হাসবেন কী কাঁদবেন বুঝতে পারেন না। বামনের চাঁদ পাওয়ার মতো অবস্থা তখন তাঁর। বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকদের একজন। যেমন প্রাজ্ঞ তেমনই সুঅধ্যাপক। তাই তাঁর টোলে সবসময়ই পাঠ নেয় একশতরও বেশি ছাত্র।

বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন নানা শাস্ত্র বিশারদ। তিনিই প্রথম মিথিলা থেকে কণ্ঠস্থ করা নব্যন্যায়ের একটি অংশকে গ্রন্থবদ্ধ করে নবদ্বীপে নব্যনায়ের অধ্যাপনা শুরু করেন।

পড়াশোনার জন্য নির্জনতার প্রয়োজন। তাই নগরের কেলাহলের বাইরে বিদ্যানগরে তাঁর টোল। সেই টোলে বসেই বাসুদেব অধ্যাপনা করাতেন। সেইসঙ্গে লিখতে থাকেন বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্রের বেশ কিছু গ্রন্থ। সেসব গ্রন্থ পরবর্তীতে কেবল বঙ্গদেশ নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায়ের পাঠ্যতালিকাতেও জায়গা করে নেয়।

এহেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রথিতযশা অধ্যাপক নিজে তাঁর বাড়িতে এসে রঘুনাথের শিক্ষার ভার নেবেন, এটা সীতাদেবীর চিন্তার বাইরে। বাসুদেবের প্রস্তাবের উত্তরে সীতাদেবী বলেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। পিতৃহারা রঘুনাথের জন্মার্জিত পুণ্যের ফলেই আপনি আজ তাঁর শিক্ষাগুরু হতে চেয়েছেন। এরপর তো আর কোনো কথাই হতে পারে না।

নিন বাবা, পিতৃহারা রঘুনাথকে আপনি নিয়ে যান। ওকে মানুষ করে তুলুন। তবে বাবা, ওর যে এখনও হাতেখড়িই হয়নি। আমি ওর হাতেখড়ির ব্যবস্থা করতে পারিনি। এখন থেকে আপনিই ওর

জীবনদেবতা। আপনার মনের মতো করে গড়ে তুলুন ওকে। রঘুনাথ আমার পড়াশোনা করে ওর বাবা এবং বংশের মুখ যাতে উজ্জ্বল করতে পারে সেই আশীর্বাদ ওকে করুন।

'খ' নয় কেন আগে?

বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অন্তেবাসী হলো রঘুনাথ। বাসুদেব সার্বভৌম নিজে হাতেখড়ি দিলেন রঘুনাথের। শুরু হল শিক্ষা।

শিক্ষার শুরুতেই রঘুনাথের প্রশ্নে বাসুদেব হতবাক্। তাঁর নিজের শিক্ষা ও অধ্যাপনার জীবনে কারও কাছ থেকে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শোনেননি। তাই-বা কেন, অতীতে আর কোনো অধ্যাপক কি শুনেছেন এমন প্রশ্ন?

এ প্রশ্ন কি কোনো সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসুর, নাকি কোনো বাচালের? রঘুনাথ কি তাঁকে পর্যুদস্ত করার জন্যই প্রথম প্রশ্ন করেছে?

নিজের মনেই বিশ্লেষণ করেন বাসুদেব। শেষে সিদ্ধান্তে আসেন, না, কোনো বাচালতা করেনি রঘুনাথ। তার প্রশ্নের পেছনে অবশ্য কেবলই কৌতূহল নেই, আছে প্রকৃত ছাত্রের গুণ—জিজ্ঞাসা। 'পরিপ্রশ্নের' জ্ঞান অর্জনের যে কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ করেছেন গীতায়, রঘুনাথের প্রশ্ন তো সেই ধারারই অনুগামী। তাই ক্রোধ নয়, বরং একধরনের স্নেহেই রঘুনাথের জিজ্ঞাসার উত্তর দেন বাসুদেব।

বৈদিক রীতিতেই ব্যাকরণ দিয়ে শুরু হয়েছিল পাঠ। সেই ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের আগে প্রয়োজন বর্ণ পরিচয়ের। অক্ষরজ্ঞান না হলে তো শিক্ষার পথে এগোনোই যাবে না। তাই স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন বাসুদেব। আর তখনই ছাত্রের প্রশ্নে অধ্যাপকের প্রায় চেতনা হারানোর মতো অবস্থা।

রঘুনাথের প্রশ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণের শুরু কেন 'ক' দিয়ে। 'ক'-এর আগে 'খ' এলেই-বা কী অসুবিধা হতো? কেবল তাই নয়, রঘুনাথ জানতে চায়, বর্ণমালায় কেন রয়েছে দুটি 'ন' দুটি 'ব' বা দুটি 'জ'? 'শ'-এর সংখ্যাই-বা তিন কেন?

রঘুনাথের এহেন প্রশ্নে প্রথমে আসে বিরক্তি। ক্রোধ আক্রান্ত করে মস্তিষ্ককে। তারপর বাসুদেবের মনে হয় এমন প্রশ্নই তো করা উচিত। কারণ না জেনে কেবল তোতাপাখির মতো মুখস্থ করাটা তো প্রকৃত শিক্ষা নয়। এই যে বর্ণমালার ক্রম—তারও পেছনে তো কাজ করছে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তা। তাই বর্ণমালা শেখানোর শুরুতেই রঘুনাথকে ব্যাকরণের জ্ঞানও দিতে থাকেন অধ্যাপক বাসুদেব।

বর্ণমালার বিন্যাসে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাজ করছে, ব্যাকরণের সেই সূত্রগুলিই শেখাতে থাকেন বাসুদেব। বলেন, বর্ণমালা স্বাভাবিক স্বরসম্ভূত। কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গকে কাজে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় বর্ণ। বর্ণ উচ্চারণের সময় এই পাঁচটি অঙ্গের একটি প্রাধান্য থাকে। উচ্চারণ স্থান অনুসারে বর্ণমালার বর্ণগুলিকেও তাই পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যেমন, কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য বর্ণ।

এইভাবে বর্ণমালা শেখানোর সময়ই বাসুদেব সার্বভৌম ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম-বিধি শেখাতে থাকেন রঘুনাথকে। সোজা কথায়, রঘুনাথ একইসঙ্গে শেখেন বর্ণমালা আর ব্যাকরণ। এত অল্পবয়সে এমন অসাধারণ তর্ক আর বিচারশক্তির পরিচয় দিয়ে রঘুনাথ বাল্যেই আগামীদিনের এক প্রজ্ঞাবানের আগমনের বার্তা দেন।

রঘুনাথের মেধার কারণেই বাসুদেব নিজের সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে তাকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতে থাকেন।

রঘুনাথ মেধাবী। রঘুনাথ স্মৃতিধর। রঘুনাথ মননশীল। তাই অধ্যাপক তাকে দিনের বেলা যা শেখান, রাতে সেগুলিই সে লিখে ফেলে। তারপর সেই পাঠ সম্পর্কে অতিরিক্ত যেসব প্রশ্ন ওঠে তা বিচারবিশ্লেষণ করে আলাদাভাবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করতেন। অনেক সময় সেগুলি গুরু বাসুদেবের সিদ্ধান্তেরও বিরোধী হতো।

গুরু বুঝি হীনপ্রভ

রঘুনাথ অকপট। রঘুনাথ সরলমতি। কিছুটা-বা বাস্তববুদ্ধিহীন। জ্ঞানের তৃষ্ণাতেই তিনি অধ্যাপকের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতেন। সেই বিরোধী সিদ্ধান্তে অধ্যাপকের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা ভাবতেন না একবারও। সবই দেখাতেন অধ্যাপককে।

বাসুদেব দেখতেন। বুঝতে থাকেন ছাত্র তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী। অচিরেই হয়তো পাণ্ডিত্যে ছাপিয়ে যাবে তাঁকেও। এই চিন্তা যে তাঁর ভালো লাগতো না তা নয়। শাস্ত্রেই তো পুত্র ও শিষ্যকে পরাজয় বাঞ্ছা করার কথা বলা হয়েছে। সেই নির্দেশের কথা মাথায় রেখে তিনি রঘুনাথকে উৎসাহ দিতেন প্রথম দিকে। অনুপ্রাণিত করতেন। আর রঘুনাথও তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় বিভাসিত করতে থাকেন নানা বিষয়কে।

বাসুদেব সার্বভৌম লিখেছিলেন 'সার্বভৌম নিযুক্ত' নামে ন্যায়ের একটি টীকা। বহু প্রশংসিত ওই টীকা গ্রন্থ। কিন্তু রঘুনাথ সেই গ্রন্থেও নানা ত্রুটি দেখতে পেলেন। কার্যত ওই গ্রন্থটি যে সারহীন একথাই বললেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁদের পাঠ্য 'চিন্তামণি' ও যে ভুলে ভরা এমন কথাও রঘুনাথ বলতে থাকেন নানা নিবন্ধে।

বাসুদেব এবার বুঝতে পারেন, এ ছাত্রকে আর পড়ানো সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। বলতে দ্বিধা নেই এই ছেলের পাণ্ডিত্য এখন তাঁকে ছাপিয়ে গেছে। এরপর তাকে শিক্ষা দিতে গেলে ভবিষ্যতে হয়তো অপদস্থই হতে হবে তাঁকে।

রঘুনাথ নিজেও বুঝতে পারে তাঁর গুরুর সীমাবদ্ধতা। ভাবেন, এরপরও এঁর কাছে শিক্ষা নিতে থাকলে হয়তো দেখা দেবে কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা। তাই একদিন সবিনয়ে বলেন আচার্যকে, আপনি অনুমতি দিলে আমি মিথিলায় গিয়ে নব্যন্যায়ের উচ্চতর পাঠ নিতে পারি।

অনুমতি দিলেন বাসুদেব। রঘুনাথ একদিন নবদ্বীপ থেকে রওনা হলেন মিথিলার পথে।

পথিকৃৎ বাসুদেব

আচার্য বাসুদেবও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন মিথিলাতে তাঁর

অধ্যাপক ছিলেন পক্ষধর মিশ্র। তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হন বাসুদেব।

সেসময় নব্যন্যায়ের সব গ্রন্থ কুক্ষিগত ছিল মৈথিলী অধ্যাপকদের। ন্যায়ের ওইসব গ্রন্থ মিথিলার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। ফলে নব্যন্যায় অধ্যয়নের একমাত্র কেন্দ্র মিথিলা। একমাত্র মিথিলারই ছিল নব্যন্যায়ের উপাধি দেওয়ার অধিকার।

বাসুদেব মিথিলার সেই অধিকার খর্ব করতে চাইলেন। মিথিলা থেকে কোনো গ্রন্থ বাইরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথচ গ্রন্থ ছাড়া তো মিথিলার বাইরে নব্যন্যায় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। তাই তিনি নব্যন্যায়ের গ্রন্থ বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা অভিনব উপায় নিলেন। গ্রন্থ যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু কেউ যদি সে গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেয়, তাহলে তো সেই গ্রন্থের বাইরে যাওয়া আটকানো যাবে না। বাসুদেব হন সেই পথযাত্রী।

কয়েক বছর ধরে দিবারাত্র পরিশ্রম করে তিনি নব্যন্যায়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'চন্তামণিশাস্ত্র'র চারটি খণ্ডই একবারে আদ্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেন। সেই পাঠ সাঙ্গ করে বাসুদেব 'কুসুমাঞ্জলি'ও মুখস্থ করা শুরু করেন।

পক্ষধরের টোলের ছাত্ররা ততদিনে বাসুদেবের মতলবটি ধরে ফেলেছেন। তাই বাসুদেবের পক্ষে কুসুমাঞ্জলি মুখস্থ করা সম্ভব হলো না। সেইসঙ্গে মিথিলায় থাকাটা আর নিরাপদ হবে না বুঝেই বাসুদেব বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চান।

সানন্দেই অনুমতি দিলেন পক্ষধর মিশ্র। এবার উপাধি দেওয়ার পালা। তারজন্য শুরু হলো শলাকা পরীক্ষা। কঠিন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাসুদেব হলেন 'সার্বভৌম'। ফিরে এলেন নবদ্বীপে। টোল খুলে পড়াতে থাকলেন তাঁর মুখস্থ করে আনা 'চিন্তামণি'।

গুরুর পথেই মিথিলায়

বাসুদেব মিথিলায় যান ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বয়স তখন তাঁর বছর কুড়ি। নানা পরীক্ষার গণ্ডি পার হয়ে তিনি পক্ষধর মিশ্রের টোলে ভর্তি হতে পারেন নব্যন্যায় পড়ার জন্য।

এর প্রায় বছর ত্রিশ পরে ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাসুদেবেরই ছাত্র রঘুনাথ মিথিলায় এলেন নব্যন্যায় পড়তে। বয়স তখন তাঁর বছর বাইশ। তিনিও ভর্তি হতে চান পক্ষধর মিশ্ররই টোলে। তারজন্য তাঁকেও দিতে হয় একাধিক পরীক্ষা।

পক্ষধর মিশ্রের তখন বয়স হয়েছে। মিথিলায় তিনি তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক। সব অর্থেই। তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ তিনি সকলকেই দেন না। এমনকী প্রথমেই তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, দেখাও করতেন না। নিয়ম করেছিলেন টোলের প্রবীণ ছাত্রদের যারা তর্কে হারাতে পারবে, তারাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে।

পক্ষধর মিশ্রের ওই শর্তমতো রঘুনাথকে প্রথমে টোলের উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছিল। এবং অনায়াসেই তাদের তিনি পরাজিত করেন। সেই সঙ্গে পক্ষধর মিশ্রের মুখোমুখি হওয়ারও সুযোগ পান।

পক্ষধর মিশ্র ছিলেন অধ্যয়ন কক্ষে। রঘুনাথ তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা মাপার জন্য একটি প্রশ্ন করেন পক্ষধর।

রঘুনাথ উত্তর দিতে গিয়ে কেমন যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হলো। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই সরছে না। জানা সত্ত্বেও ওই মুহূর্তে পক্ষধরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। পক্ষধর কিছুটা শ্লেষের সুরেই বলেন, এই সামান্য প্রশ্নের উত্তরটাও জানা নেই তোমার? এই জ্ঞান নিয়ে আমার কাছে পড়তে চাও।

মাথা নত করে বেরিয়ে আসেন রঘুনাথ। পরদিন আবার যান তিনি পক্ষধরের সেই অধ্যয়নকক্ষে। আবারও সেই একই অবস্থা। তৃতীয় দিনেও তাই। রঘুনাথ কিছুতেই বুঝতে পারেন না, কেন এমন হচ্ছে? পক্ষধরের সামনে গেলেই কেন লোপ পাচ্ছে তাঁর সব বিদ্যাবুদ্ধি? কেন বলতে পারছেন না একটিও কথা? কেন—কেন?

তাহলে কী—। হঠাৎই তড়িৎরেখা। ওটি তো পক্ষধরের অধ্যয়ন অর্থাৎ সাধনকক্ষ। তারই প্রভাবে এমনটা হচ্ছে তাঁর। এটা বোঝা উচিত ছিল তাঁর আগেই।

এই বোধে আবিষ্ট হয়েই চতুর্থ দিনে রঘুনাথ যান মিশ্র ভবনে। দেখেন, পক্ষধর ঘরে নেই। কিন্তু তাঁর আসনের সামনে গ্রন্থপীঠের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি পুথি। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। পুথিকে তো কোনো সময়ই খোলা অবস্থায় রাখা হয় না। এ শিক্ষা তো তাঁরা পেয়েছেন প্রথম পাঠের সময়ই। তাহলে পক্ষধরের মতো এমন মহামহোপাধ্যায় এমন ভুল করলেন কী করে!

একটু ভেবেই রঘুনাথ সিদ্ধান্তে আসেন, পণ্ডিতমশাই হয়তো কোনো একটি গূঢ় সমস্যায় বিভোর ছিলেন। সে কারণেই তাঁর এই ভ্রান্তি। কিন্তু কী এমন সমস্যা?

কৌতূহলী রঘুনাথ দেখতে থাকেন পুথিটির পাতা। না, তেমন কোনো জটিল বিষয়ই তাঁর নজরে এল না। আবারও ভালো করে পড়েন। আর তখনই দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ হয় একটি শব্দের ওপর। 'ন' কারন্ত একটি শব্দ। এই 'ন' সপ্তমী নিষ্পন্ন হলে তা হয় নিষেধাত্মক। কিন্তু বাক্যের সে অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটিকে যদি তৃতীয়ার একবচন সম্পন্ন শব্দ বলে অর্থ করা হয়—তা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

রঘুনাথ তাঁর এই বিচার একটি পাতায় লিখে পুথির ওপর রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন।

একটু পরেই ঘরে ঢোকেন পক্ষধর মিশ্র। পুথির ওপর পাতাটি দেখে অবাক হন তিনি। কোথা থেকে এল এটি। তাড়াতাড়ি পড়তে থাকেন সেটি।

পড়তে পড়তে উদ্ভাসিত পক্ষধরের বিষণ্ণ মুখ পরম আনন্দ আর বিস্ময়ে। তিনি রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, এটি কি তোমার লেখা?

নীরবে মাথা হেলিয়ে রঘুনাথ জানান, হ্যাঁ ওটি তারই লেখা।

বৃদ্ধ অধ্যাপক আনন্দে প্রায় চিৎকার করে বলেন, সাধু—সাধু।

বলেন—বলো কী তোমার অভিপ্রায়? কোনো বক্তব্য নিয়ে এসেছো তুমি আবার?

সবিনয়ে বলেন রঘুনাথ, কৃপা করে আপনি যদি আপনার এই সাধনকক্ষের বাইরে আসেন তাহলে আমি নিশ্চিন্তমনে নিবেদন করতে পারি আমার কথা। এই কক্ষে আপনার তপস্যার প্রভাবে আমার সবকিছু বিলুপ্ত হয়। কেমন এক জড়ত্বের যবনিকা নেমে আসে। তাই যদি—

পক্ষধর হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে আসেন। বলেন, এবার শোনাও তোমার বক্তব্য।

রঘুনাথ নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠেই উপস্থাপন করেন তাঁর বক্তব্য। শুরু হয় কথা বা বক্তব্য কাটাকুটির খেলা। একসময় রঘুনাথের সিদ্ধান্তই মানতে বাধ্য হন পক্ষধর। সেই সঙ্গে রঘুনাথকে গ্রহণ করেন তাঁর টোলের ছাত্র হিসেবে।

এক চক্ষু তুমি কে হে বাপু

এটা ছিল অনিবার্য। পূর্ব নির্ধারিতও। রঘুনাথ প্রথম যেদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন তাকে যাচাই করার জন্যই পক্ষধর একটু শ্লেষ ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, সহস্রলোচন ইন্দ্র, ত্রিনেত্র মহেশ্বর, কিন্তু একচক্ষু তুমি কে হে বাপু?

শ্লেষে বিদ্ধ হয়েও রঘুনাথ শান্ত, সংযত কণ্ঠেই বলেন, আমি নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি। একটা কথা কী জানেন, অন্ধের দৃষ্টি যিনি ফিরিয়ে দেন, শিশুর জ্ঞান চক্ষু যিনি উন্মীলন করেন তিনিই এই ভুবনে যথার্থ গুরু—অধ্যাপক, বাকিরা কেবলই 'অধ্যাপক নামধারী'।

পক্ষধর ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং আগন্তুকের শিষ্টতাবোধ এবং তাৎক্ষণিক মেধায় মুগ্ধ হলেন। এমন শিষ্য বা ছাত্রই তো কামনা করেন অধ্যাপকরা। এই মুহূর্তে রঘুনাথকে শিষ্য হিসেবে মনে মনে গ্রহণ করেন পক্ষধর।

মনে মনে রঘুনাথকে ছাত্র হিসেবে মেনে নিয়েও পক্ষধর কিন্তু প্রথাভঙ্গ করলেন না। তাঁর টোলে ভর্তি হবার যেসব নিয়ম বা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তিনি, তার ব্যত্যয় ঘটাবেন না এখনই। তাই সেইসব পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে তাতে উত্তীর্ণ হয়েই রঘুনাথ ঠাঁই পেলেন পক্ষধরের টোলে।

রঘুনাথের প্রতি পক্ষধরের ব্যবহার কেমন যেন বিভ্রান্ত করে সকলকে। প্রকাশ্যে পক্ষধর যেন সদা-অপ্রসন্ন। সময়ে-অসময়ে তাঁকে তাড়না করেই যেন তিনি আনন্দ পান।

আবার রঘুনাথ যে তাঁর অন্য ছাত্রদের চেয়ে আলাদা, তার যে বিশেষ কিছু গুণ আছে, সে যে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মেধাবী সেটা প্রমাণ করারও নানা সুযোগ করে দেন।

সেদিন যেমন, মিথিলার বেশ কিছু অধ্যাপক এবং বহু ছাত্রের সামনে আচমকাই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন পক্ষধর। রঘুনাথকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া কোন কোন শাস্ত্রে পারঙ্গম তুমি?

বিনম্র কণ্ঠে রঘুনাথ জানায়, ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া কাব্যশাস্ত্রে রয়েছে তাঁর বিশেষ অধিকার। বলেন, 'চিন্তামণি' গ্রন্থ যাঁর অধিগত তাঁর পক্ষে সুললিত রসস্নিগ্ধ কবিতা রচনা করা কোনো ব্যাপারই নয়। চুমুকে চুমুকে গরল পান করেন যে মহেশ্বর তিনি কি সাপ খেলাতে ভয় পান কখনও?

পক্ষধর পালটিয়ে বলেন, ব্যাকরণবিদ ও নৈয়ায়িকদের হৃদয়ভূমি একবারে খরার ফুটিফাটা শস্যক্ষেত্রের মতো। এতটুকু রসের অস্তিত্ব নেই তাঁদের অন্তরে। একজন কেবল খ-ছ-ফ-ঠ নিয়ে আর অন্যজন ঘট-পট ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কবিতা কল্পনা লতাকে লালন করার সময় কোথায় তাঁদের?

উত্তরে রঘুনাথ সুললিত সুরে আবৃত্তি করতে করতে বলেন, ব্যাকরণবিদ ও নৈয়ায়িকরা আপাত-নীরস যুক্তিময় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তাঁদের অন্তর-সাগরে কাব্যরসের অভাব হয় না কখনই।

পক্ষধর একমত না হয়েই বলেন, কোনো প্রকরণ জানলেই হয় না। তাকে রসঘন রূপে প্রকাশের জন্য একটা মানসিক ব্যক্তিরও প্রয়োজন। প্রযুক্তিবিদ্‌রা যেমন শিল্পী নন, প্রকরণে অভিজ্ঞরাও একই ভাবে কবি নন। সুকোমল কবিতা লিখতে পারেন না তাঁরা।

জমে ওঠে গুরু-শিষ্যের তর্ক। সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই তর্ক-দ্বৈরথ উপভোগ করতে থাকেন। ছাত্রদল বুঝতে পারে রঘুনাথের সঙ্গে তাদের তফাতটা কোথায়? কেনই-বা আপতকঠোর অধ্যাপক নবদ্বীপ আগত এই ছাত্রটিকে এত ভালোবাসেন।

সেদিন গুরুর সঙ্গে বিচারের সময় রঘুনাথ চন্দমধুর বেশ কিছু কোমল-কান্ত-ললিত পদ রচনা করে তাঁর কবিত্ব শক্তির অপূর্ব নিদর্শন রাখেন। মনে মনে সেদিন সকলেই স্বীকার করেন অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী রঘুনাথ। ইচ্ছা করলেই মহাকাব্য রচনা করে স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হতে পারতেন তিনি।

মিথিলায় রঘুনাথ মনপ্রাণ দিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রঘুনাথের মেধা, তাঁর বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং নানা ধরনের উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বৃদ্ধ অধ্যাপক পক্ষধর মোহিত। তার অধ্যাপনা জীবনে রঘুনাথের মতো ছাত্র কখনই পাননি। তাই বিচারের সময় রঘুনাথের প্রতি নির্মম হলেও মনে মনে তাকে ভালোবাসেন জগৎসংসারের আর সবকিছুর চেয়েও বেশি। উপযুক্ত আধার পেয়ে পরমানন্দেই পক্ষধর নিজেকে উজাড় করে সেই আধারকে পূর্ণ করতে থাকেন। তিনি যত দেন, রঘুনাথ সবই আত্মস্থ করে আরও জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন অন্যকোনো বিষয়ের জন্য। পক্ষধরও পরমযত্নে মেটান রঘুনাথের সেই জ্ঞানতৃষ্ণা।

একচক্ষু হওয়ার কারণে প্রথম থেকেই টোলের একদল ছাত্র নানাভাবে তাকে হেয় ও অপদস্থ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার পাণ্ডিত্যের প্রতি গুরু পক্ষধরকে এত মুগ্ধ হতে দেখে তাদের তাচ্ছিল্য করার মনোভাব ক্রমেই তীব্র হিংসায় পরিণত হয়। বিশেষ করে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ছাত্ররা জোট বাঁধে রঘুনাথের বিরুদ্ধে। একসময় তাদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

রঘুনাথ নব্যন্যায় শিখে মিথিলা থেকে ন্যায়শাস্ত্রের পুথি নবদ্বীপে

নিয়ে যাবেন, নবদ্বীপকে নব্যন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করবেন এই বাসনাতেই মিথিলায় এসেছিলেন। তাই সব ভুলে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ সমাপন করেছেন তিনি। এবার তিনি নবদ্বীপে ফিরতে চান। সত্যি কথা বলতে কী, ছাত্রদের অসূয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। তাই এবার নবদ্বীপে ফিরতে কৃতসংকল্প তিনি।

বর্ষা শেষে এসেছে শরৎ। আবহাওয়া নির্মল। রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন পক্ষধর মিশ্রের কাছে।

ক্রোধে অন্ধ রঘুনাথ

রঘুনাথের মনে একটু সংশয় ছিল। ভেবেছিলেন গুরু পক্ষধর হয়তো এখুনি তাঁকে দেশে ফিরতে দেবেন না। হয়তো আরও কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্রের গভীর কোনো তত্ত্ব শেখাবার জন্য মিথিলায় থেকে যেতে বলবেন।

কিন্তু আশ্চর্য, রঘুনাথ দেশে ফেরার কথা বলতেই পক্ষধর বলেন, হ্যাঁ এখন তোমার দেশে ফেরাটাই বেশি মঙ্গলজনক।

পক্ষধরের একথার মধ্যে রঘুনাথ যেন একটা রহস্যের গন্ধ পান। কিন্তু রহস্যটা যে ঠিক কী তা বুঝতে না পারার কারণে গুরুদেবের কাছে থাকেন আরও কিছুক্ষণ। আর ওইসময়ই পক্ষধরের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় আসল সত্যটা।

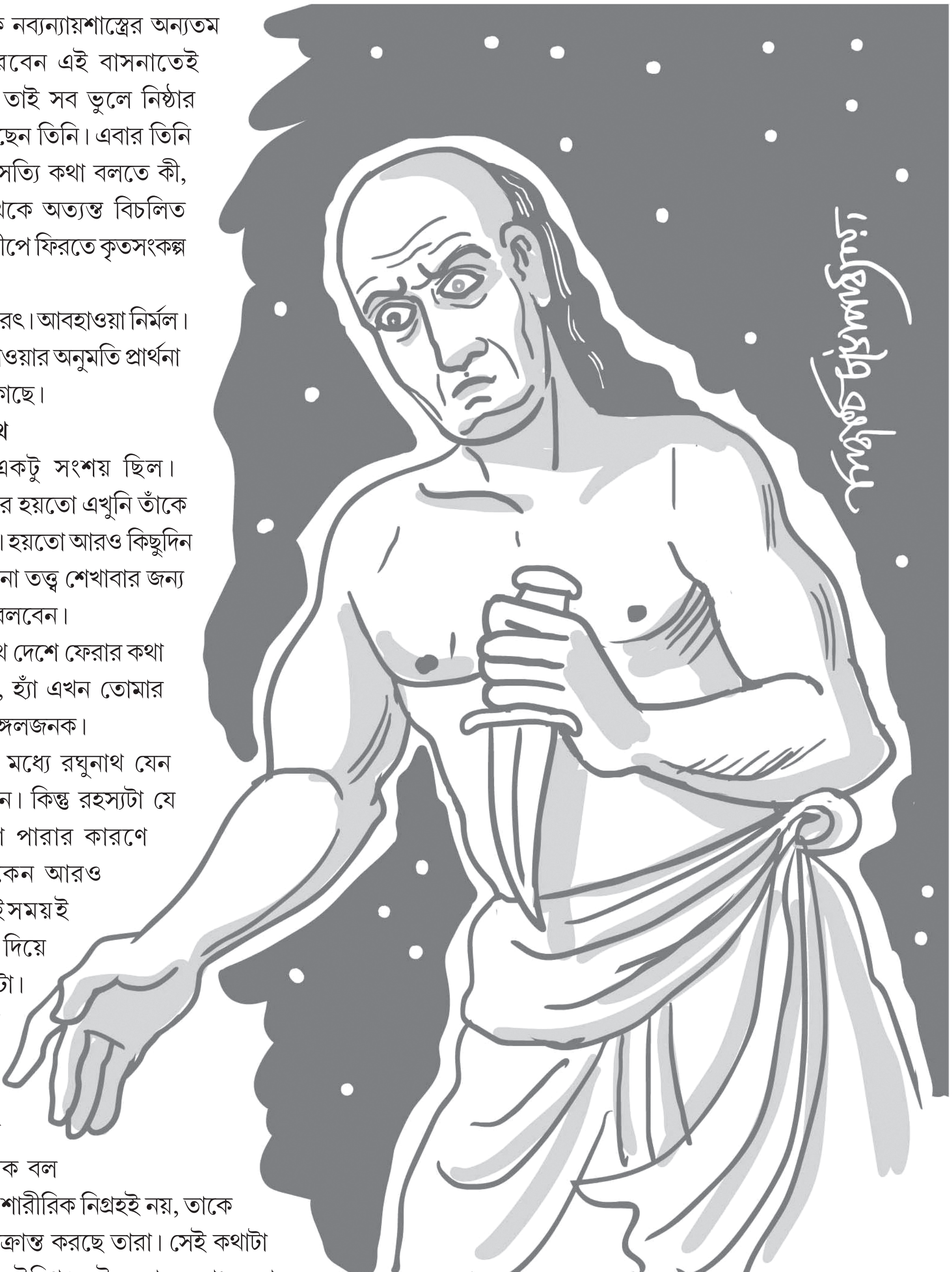

রঘুনাথের প্রতিভা দেখে টোলেরই বেশ কিছু ছাত্র রীতিমতো 'ঈর্ষান্বিত'। মেধায় না পেরে তারা এখন কায়িক বল প্রয়োগের কথা ভাবছে। শারীরিক নিগ্রহই নয়, তাকে একবারে প্রাণে মারার চক্রান্ত করছে তারা। সেই কথাটা কানে আসতেই পক্ষধর উদ্বিগ্ন। ওই চক্রান্ত রোধ করার কোনো উপায় না পেয়ে রঘুনাথকে ফিরে যাওয়ার কথা বলবেন বলে ভেবেছিলেন। এখন রঘুনাথ নিজেই ফিরে যেতে চাওয়ায় পক্ষধর যেন বাঁচলেন। সেই স্বস্তিই প্রকাশ পেল তাঁর কথায়। বললেন, হ্যাঁ তুমি এবার দেশে ফেরার প্রস্তুতি নাও।

রঘুনাথ দেশে ফিরবেন। সেখানে টোল খুলে ছাত্রদের পড়াবেন নব্যন্যায়। এই শাস্ত্র পড়ার জন্য আর কাউকে মিথিলায় আসতে হবে না। তবে সমস্যা একটাই, পড়ানোর জন্য তো চাই বই। মিথিলা ছাড়া আর কোথাও নব্যন্যায়ের পুঁথি নেই। তাই পক্ষধরের কাছে কয়েকটি পুঁথি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চান রঘুনাথ।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষধর বলেন, অসম্ভব। মিথিলার বাইরে কোনো পুঁথি নিয়ে যাওয়া যাবে না। নিয়ে যেতে দেব না।

পক্ষধরের এই রূঢ়তায় আহত হন রঘুনাথ। মনে মনে বলেন, এ তো অন্যায়। বিদ্যাধন তো কেউ এভাবে কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না। অধ্যাপকরা তো ব্যবসায়ী মজুতদার নন। তাহলে কেন হবে তাঁদের এমন মনোবৃত্তি। এর একটা প্রতিকার করতে হবে।

এবং করবেন তিনিই।

পক্ষধরের স্নেহ তিনি পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন সময় যেভাবে অপমানিত হতে হয়েছে গুরুদেবের কাছে তা ভুলতে পারেননি রঘুনাথ। মনে পড়ে, অনেক সময়ই তাঁর সঙ্গত মতের বিরোধিতা করেছেন পক্ষধর প্রায় অকারণে। যুক্তিতে না পেরে তিনি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেছেন সকলের সামনে। নিজের মত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েও লোকলজ্জার ভয়ে রঘুনাথের সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা স্বীকার করেননি। উলটে গুরু হওয়ার সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে তাঁকে অর্বাচীন, নির্বোধ, বেল্লিক ইত্যাদি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে হতমান করেছেন।

সেসময় অন্যান্য ছাত্রদের বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ তীরের মতোই তাঁর হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। এর যোগ্য জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সকলের অট্টহাসির ঝড়ে উড়ে গেছে তাঁর সব চেষ্টা।

ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। প্রতিজ্ঞা করেছেন পক্ষধরকে তাঁর স্বমতে আনবেনই। যদি না পারেন, তাহলে হত্যা করবেন পক্ষধরকে।

সে সময় ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেও এদিন আর পারলেন না। সেদিন তাঁর ক্রোধের আগুনে জল ঢেলেছিলেন পক্ষধর নিজেই। আকেজর সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। সেইসঙ্গে মান্যতা পেয়েছিল রঘুনাথের মত।

কিন্তু আজকের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যদি পুঁথি নিয়ে যেতে না পারেন, তাহলে নবদ্বীপকে ন্যায়চর্চার পীঠস্থানে বসাবেন কী করে? কী করে নবদ্বীপকে দেবেন উপাধি দেওয়ার অধিকার।

এই চিন্তা ক্রুদ্ধ করে তোলে রঘুনাথকে। ক্রোধের ধর্মই এই। ক্রোধে সম্মোহিত হয় মানুষ। লুপ্ত হয় হিতাহিত জ্ঞান। তখন ক্রোধের আগুনে সব কিছু ছারখার করাই হয় লক্ষ্য। রঘুনাথেরও হলো তাই। যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হাজারবার ভাবার যে আপ্তবাক্য শোনা গেছে মনীষী কণ্ঠে তা বিস্মৃত হলেন রঘুনাথ।

ওই মুহূর্তে রঘুনাথ এক ক্ষুধিত শার্দূল। অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। শিক্ষকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব তিনি তখন। রঘুনাথ কৃতসংকল্প, ওই রাতেই গুরু পক্ষধরকে হত্যা করবেন তিনি।

পক্ষধরকে হত্যা করার একটি ছক কষে ফেলেন রঘুনাথ। হত্যা করার জন্য সংগ্রহ করেন একটি বেশ বড়ো ছুরি। ঠিক করেন, গভীর রাতে সবাই যখন গভীর ঘুমের দেশে চলে যাবে, সেই সময়েই তিনি হত্যা করবেন পক্ষধরকে। তারপর ন্যায়শাস্ত্রের বিভিন্ন পুঁথি নিয়ে মিথিলা ছেড়ে চলে যাবেন তিনি নবদ্বীপে। নবদ্বীপ হবে তখন নব্যন্যায় সাধনার দ্বিতীয় সাধন পীঠ।

সিদ্ধান্ত মতো প্রতীক্ষা করতে থাকেন রঘুনাথ উপযুক্ত সময়ের জন্য। ক্রমে রাত হয় গভীর। সেটা ছিল শুক্লপক্ষ। শরতের পরিষ্কার নীল আকাশ। রূপালি চাঁদের মায়াবী জোছনায় চারিদিক উদ্ভাসিত। ঝরে পড়া শিউলির সুবাসে চারিদিক আমোদিত। এমন রাতে ঘরে মন টেকে না কারও।

পক্ষধর মিশ্র এবং তাঁর স্ত্রীও প্রকৃতির ওই রূপ দেখার জন্যই ঘর ছেড়ে উঠেছেন বাড়ির ছাদে। মেতেছেন নানা রসালাপে।

শরতের সেই 'ফুল্ল কুসমিত পুলকিত যামিনী' কিন্তু কোনো ভাবেই রঘুনাথের মনে কোনো ভাবান্তর আনতে পারল না। বস্তুত, রঘুনাথ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। পক্ষধরের অহংকার খর্ব তিনি করবেনই। নব্যন্যায়ের গ্রন্থগুলিকে যখের ধনের মতোই আঁকড়ে রেখেছেন তিনি। মিথিলার মান রাখতে বঞ্চিত করছেন বাকি দেশকে। এর প্রতিকার তিনি করবেনই। কেড়ে নেবেন ওই যখের ধন। তার জন্য যদি গুরু তথা নরহত্যা করতে হয়, তাতেও পিছপা হবেন না।

রঘুনাথের ভাবনার কেন্দ্রে তখন একটা বিষয়ই আবর্তিত হচ্ছে। নবদ্বীপকে নব্যন্যায়চর্চার অন্যতম পীঠভূমি করতে হবেই। নব্যন্যায়ের উপাধি দানে মিথিলায় এই একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাবেন তিনি। তার জন্য হত্যার মতো ভয়ংকর ঘৃণ্য অপরাধ করার জন্য আজ তিনি কঠিন শপথবদ্ধ। সেই শপথকে সত্য করতেই মিশ্র আবাসে প্রবেশ করলেন রঘুনাথ।

রাত দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। সুষুপ্তির সময় সেটা। রঘুনাথ উঁকি মারেন মিশ্র দম্পতির শয়নঘরে। না শূন্য সে শয়ন মন্দির। অন্য কোনো ঘরেও নেই পক্ষধর। তাই সিঁড়ি বেয়ে রঘুনাথ আসেন ছাদে। দেখেন মিশ্রদম্পতি মগ্ন নানা কথায়। সুযোগের অপেক্ষায় রঘুনাথ লুকিয়ে থাকেন ছাদেই এক গুপ্ত স্থানে।

রঘুনাথের হাতে শাণিত ছুরি। চাঁদের আলোয় চকচক করছে সেটি। সেই ক্ষুরধার ছুরির দিকে তাকিয়ে ভাবেন রঘুনাথ— আর কিছুক্ষণ। তারপরই রং বদলাবে ছুরির। রুপালি ছুরি হবে লালে লাল।

রঘুনাথ অপেক্ষারত। অকস্মাৎ মিশ্র দম্পতির কিছু কথার আঘাতে খানখান রঘুনাথের মনের আয়নাটি। কানে আসে গুরুপত্নীর কিছু কথা। আদুরে ষোড়শী বধূর গাঢ় ঘন স্বর তাঁর কণ্ঠে। বলেন, এই রুপোঝরা চাঁদনি রাতকে সাক্ষী রেখে একটা সত্যি কথা বলবে?

উন্মুখ রঘুনাথ। কোন সত্যি জানতে চাইছেন গুরুমা! রঘুনাথের মতোই পক্ষধরও বোধহয় একটু বিচলিত স্ত্রীর এমন আচমকা কথায়। তিনি ফিরে যান বোধহয় সেই যৌবনের দিনগুলিতে। স্ত্রীর মতোই গাঢ় কণ্ঠে বলেন কী এমন কথা যে চাঁদনি রাতকে সাক্ষী রাখছ?

—না, তেমন কিছু নয়। আজ একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

—কী কথা?

—তোমার কাছে কোনটা বেশি নির্মল? কোনটা বেশি অমলিন— কলঙ্কশূন্য।

উত্তরটা শোনার জন্য কান পাতেন রঘুনাথ। উদ্‌গ্রীব গুরুপত্নী স্বামীর উত্তর দিতে দেরি দেখে বলেন, তুমি নিশ্চয় আমার কথা বলবে? কিংবা আমাদের সন্তান অথবা আকাশের ওই শরৎশশীকে।

পক্ষধর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না। বরং একটু চুপই থাকেন। ফলে গুরু-মায়ের তাগাদা, কী হলো বলো?

পক্ষধর বলেন, দেখো, আমার উত্তরটা হয়তো তোমার ভালো

লাগবে না। তাই বলছি বাদ দাও কথাটা।

—না, না, বলো তুমি। কথা দিচ্ছি কিছুই মনে করবো না আমি। তবুও কিছুক্ষণ চুপই থাকেন পক্ষধর। ওই সময়টায় রঘুনাথেরও বুক দুরু দুরু। কী বলবেন গুরুদেব তা জানার জন্য মুখিয়ে থাকে রঘুনাথ। ওদিকে তাগাদা দেন পক্ষধর জায়াও। বলেন, কই বলো।

প্রথমেই শুনে রাখো, তুমি যে তিনের নাম বললে তার কোনোটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি নির্মল নয়।

—তবে?

—নবদ্বীপ থেকে আমার কাছে পড়তে এসেছে যে ছাত্রটি— সেই রঘুনাথের বুদ্ধিই সবচেয়ে বেশি নির্মল। ওর মতো নির্মলবুদ্ধির কাউকে আমি দেখিনি।

একথায় পক্ষধরের স্ত্রী কিন্তু অপ্রসন্ন হলেন না। বরং পক্ষধরের কথার সঙ্গে একমত হয়েই বলেন, ঠিক বলেছো। তোমার এতো ছাত্রকে তো দেখলাম, কিন্তু ওর মতো কাউকে দেখিনি আগে।

যেন বাজপড়া গাছ

ধু ধু প্রান্তরে বাজপড়া গাছটার মতো দাঁড়িয়ে তখন রঘুনাথ। এ কী করতে যাচ্ছিলেন তিনি। যিনি তাঁর বুদ্ধিকে এই বিশ্বের সবচেয়ে নির্মল বলে মনে করেন তাঁকেই কেন হত্যা করতে যাচ্ছিলেন সেই বুদ্ধির প্ররোচনায়। ধিক ধিক অমন বুদ্ধিকে, ধিক আমাকে। যে মহাপাপ আমি করতে যাচ্ছিলাম তার কোনো ক্ষমা হয় না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে এই জীবন দিয়ে।

এমনই চিন্তায় থরথর করে কাঁপতে থাকেন রঘুনাথ। দু'চোখে জলের ধারা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন রঘুনাথ। কান্নার দমকে পড়ে যায় হাতের ছুরিটা। নিস্তব্ধ রাতকে ফালাফাল করে পড়ে যাওয়া ওই ছুরির ঝনঝন শব্দ।

চমকে ওঠেন পক্ষধর এবং তাঁর স্ত্রী। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটে আসেন তাঁরা। দেখেন ছাদের মেঝেতে পড়ে কেঁদে চলেছেন রঘুনাথ।

বিস্মিত পক্ষধর। রঘুনাথ কেন কাঁদছে, বুঝতে পারেন না তিনি। পারেন না বলেই থমকে দাঁড়ান তিনি। অবশ্য সেটা ক্ষণকালের জন্য। তারপরই তুলে ধরেন রঘুনাথকে। উদ্বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন তুমি?

রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে বলেন মহাপাতক আমি। ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে নিয়ে যাওয়া যাবে না বলায় আমি ক্রুদ্ধ হই। ন্যায়-অন্যায় বোধ লুপ্ত হয় আমার। আপনাকে হত্যা করার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আড়াল থেকে আপনার কথা শোনার পর আমার চৈতন্য হয়েছে। আমার এই অপরাধের জন্য শাস্তি দিন আমাকে। না হয়, বলে দিন কী করলে আমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

পক্ষধর সান্ত্বনা দেন রঘুনাথকে। বলেন, অনুতাপেই ক্ষয় হয় সব অপরাধ। শান্ত হও, কোনো অপরাধ হয়নি তোমার। কিছু মনে করিনি আমি। যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ঘরে শুয়ে আছে রঘুনাথ। মন এখন অনেক শান্ত। একটা জঘন্য অপরাধ যে করতে হয়নি তার জন্য মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

ভারমুক্ত রঘুনাথ। তবুও ঘুম আসে না। দুচোখে যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি মিথিলায় এসেছিলেন তা তো সফল হয় না এখনও। নবদ্বীপকে নব্যন্যায়চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করার শপথ তো রক্ষা হলো না। নব্যন্যায়ের গ্রন্থ নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব হবে না। সেটা না হলে স্বপ্নই-বা পূরণ হবে কীভাবে?

বিনিদ্র রাতে ভাবছেন রঘুনাথ। কেবলই ভাবছেন। অকস্মাৎ আলোকিত মন। ঠিক করেন, একদিন তাঁর প্রথম অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌম যে পথ নিয়েছিলেন, তিনিও সেই পথেরই পথিক।

সমাধান পাওয়ার পরে রঘুনাথের সব অঙ্গ হলো শিথিল। শান্ত সব স্নায়ু। রঘুনাথ তলিয়ে যেতে থাকেন গভীর ঘুমের সাগরে।

পরদিন গুরু পক্ষধরকে প্রণাম করে বলেন, আপনার অনুমতি পেলে আরও কিছুদিন আপনার কাছে থাকতে চাই। অর্জন করতে চাই ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে আরও জ্ঞান।

অনুমতি দেন পক্ষধর। শুরু হয় রঘুনাথের আরেক সাধনা। একের পর এক নব্যন্যায় গ্রন্থ পুরোপুরি কণ্ঠস্থ করতে থাকেন তিনি।

কেটে যায় আরও বছর খানেক। কাজও হয়েছে শেষ। রঘুনাথ এবার ফিরে যাবেন নবদ্বীপে। শুরু হবে তাঁর নতুন জীবন।

নবদ্বীপে রঘুনাথ

রঘুনাথ আবার নবদ্বীপবাসী। ১৪৯৭ থেকে ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ প্রায় বছর ছয়েক মিথিলায় ছিলেন তিনি। নবদ্বীপে ফিরে প্রথমেই গেলেন তাঁর বাল্যের আশ্রয়দাতা এবং প্রথম গুরু বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে।

রঘুনাথের প্রথম গুরু বাসুদেব। তিনি আশ্রয় না দিলে রঘুনাথের জীবন কোন খাতে বইতো তা কেউ জানে না। বাল্যেই রঘুনাথের প্রতিভা দেখে পরমস্নেহে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাসুদেব। তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়ে রঘুনাথ যখন মেধায় বাসুদেবকেই আক্রমণ করেন তখন থেকেই বাসুদেবের মনোভাবটা বদলে যায়। তিনি যে খুব ভালো মনে রঘুনাথকে মিথিলায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন তা নয়। তবুও রঘুনাথ সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে ছিল একটা খুব নরম জায়গা।

রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরে আসার আগেই তাঁর মিথিলা বিজয়ের কথা শুনেছিলেন তিনি। রঘুনাথ ফিরতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তা দুজায়গাতেই তোমার শিক্ষাগ্রহণ হলো। তুমি এখন কৃতবিদ্য। আচ্ছা একটা কথা সত্যি করে বলতো, নবদ্বীপ না মিথিলা কোথায় তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটলো? কোন গুরুই-বা তোমার অন্তরকে জ্ঞানের আলোকে করলেন উজ্জ্বল?

বাসুদেবের আশা ছিল রঘুনাথ তাঁর সামনে হয়তো তাঁর নামই করবেন। কিন্তু রঘুনাথ বলেন, যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে বলব, আমার জ্ঞান তৃষ্ণার প্রশমন হয়েছে মিথিলাতেই। গুরু পক্ষধরই আমাকে প্রকৃত আলোর সন্ধান দিয়েছেন। আমার কাছে আমার দুই গুরুই সমান। তবে তারতম্যের বিচারে গুরু পক্ষধরই

শ্রেষ্ঠ।

একথায় বাসুদেব সার্বভৌম খুব একটা খুশি হতে পারেননি। তবে শুনে ভালোমানুষি দেখিয়ে বলেন, তা তুমি এবার কী করবে?

রঘুনাথ সবিনয়ে বলেন, ভাবছি টোল খুলে নব্যন্যায়ের শিক্ষা দেব। এবার থেকে নবদ্বীপই নব্যন্যায়পাঠীদের দেবে উপাধি।

বাসুদেব বলেন, খুব ভালো কথা। আশীর্বাদ করি সফল হও। জয় হোক তোমার।

বাসুদেবকে প্রণাম করে বিদায় নেন রঘুনাথ। ওইসময় তিনি একবারে একা। মা মারা গিয়েছেন বহুদিন আগেই। আপনজন বলতে কেউই নেই এখানে। নেই কোনও আর্থিক সংস্থানও। সেটাই স্বাভাবিক। বলা যায় জন্ম থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী দারিদ্র্য। ফলে টোল খোলার ইচ্ছা থাকলেও সেটা কাজে পরিণত করাটা খুব একটা সহজ ছিল না।

হরি ঘোষের গোয়াল

সে সময় নবদ্বীপে যেসব ধনী ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা বিমুখ। কেউই চাইলেন না রঘুনাথকে সাহায্য করতে। অনিশ্চয়তা যখন দানা বাঁধছে সেইসময় এগিয়ে এলেন হরি ঘোষ নামে নগরের এক ধনী গোয়ালা।

হরি ঘোষের ছিল এক বিরাট গোশালা। নগরের বহু লোকই সেখানে গরু রাখতো। ফলে জায়গাটা সব সময় লোকজনের কোলাহলে জমজমাট থাকত। হরি ঘোষের এই গোশালা থেকেই চালু হয়েছে 'হরি ঘোষের গোয়াল'—বাকধারাটির।

এই হরি ঘোষই এগিয়ে এলেন রঘুনাথকে সাহায্য করার জন্য। বললেন, আমার গোশালায় অনেক জায়গা রয়েছে। ওখানে আপনি যদি টোল খোলেন, তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। টোলের আর্থিক দায়িত্বও আমিই নেব।

আপনি রাজি হলে আপনার টোল চালু হতে পারে এখানেই। এখন ভেবে দেখুন আমার গোয়ালে আপনি পড়াবেন কিনা।

'পাগলা ভাত খাবি না পাতা পেড়েই আছি'। রঘুনাথের তখন সেই অবস্থা। তাছাড়া ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া, এই বিচারের অধিকার কি ভিক্ষুকের আছে? রঘুনাথ এক কথাতেই রাজি হয়ে যান। তাঁর কথা, 'নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো', টোল যেখানেই হোক, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে সেটাই বড়ো কথা। এবং হলোও তাই।

খোলার কিছুদিনের মধ্যে জমে উঠল টোল। কেবল নবদ্বীপ বা তার আশপাশ থেকে নয়, দূরদূরান্ত থেকেও আসতে থাকে ছাত্রের দল। হরি ঘোষের গোয়ালে রঘুনাথের টোল হয়ে উঠল নবদ্বীপের সারস্বত মন্দির।

টোল খোলার কিছুদিন পরেই রঘুনাথ লেখেন 'চিন্তামণি দীধিতি'। মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধায়ের 'চিন্তামণি' অবলম্বনে এটি লেখা হয়েছিল। এতে ন্যায়শাস্ত্রের নানা তর্ক এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে এটি 'নব্যন্যায়' নামে নতুন একটি গ্রন্থ হিসেবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রঘুনাথ অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে লিখে যান বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই। ওইসব বইয়ের মধ্যে আছে—পদার্থ খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব বিবেক টীকা, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, অখ্যাতবাদ, বুৎপত্তিবাদ। এছাড়া লিখছেন লীলাবতী টীকা, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য টীকা, গুণ কিরণাবলী প্রকাশ দীধিতি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি টীকা, ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ-দীধিতি, ন্যায় নীল বিভূতি, ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি, মলিম্লুচবিবেক। শেষেরটি রচিত হয়েছিল স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে।

একলা রঘুনাথ

রঘুনাথ শিরোমণি ধীমান। মহাপ্রাজ্ঞ। আজীবন তিনি পরা ও অপরা বিদ্যাসাধনাব্রতী। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। বড়ো একা এবং সেটা সেই শৈশব থেকেই।

বাবাকে হারিয়েছেন বছর তিনেক বয়সে। একলা মা ভিক্ষা এবং দাসীবৃত্তি পর্যন্ত করে তাঁকে লালনপালন করেছেন। সে সময় দারিদ্র্য ছাড়া কেউ ছিল না তাঁদের সঙ্গে। সেই মা-ও মারা যান তিনি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে। তারপর থেকে রঘুনাথ একা,একেবারে একা। সেই একলা জীবনে দিন কেটেছে তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়।

কেউ কেউ অবশ্য বিয়ের কথা বলতেন। রঘুনাথ উত্তরে শোনাতেন শাস্ত্রবচন। বলতেন, বিয়ের প্রয়োজন তো পুত্র-কন্যার জন্য। কিন্তু তাঁর তো রয়েছে দুই পুত্র—ব্যাপ্তিবাদ আর জ্ঞানকাণ্ড এবং মেয়ে লীলাবতী। তাহলে আর কীসের প্রয়োজন বিয়ের।

রঘুনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা সত্যি। কিন্তু বাস্তবে একা থাকার বেদনাটা বোধহয় বিদ্ধ করতো নিরন্তর।

ইতিহাস বলে, অধ্যাপনা আর পুস্তক রচনার খাত বেয়ে রঘুনাথের জীবন-নদী শেষপর্যন্ত লীন হয়ে যায় মহামুক্তির মহাসাগরে ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বয়স তখন তাঁর চৌষট্টির কাছাকাছি। নিয়মেই রঘুনাথ প্রস্থান করেন এ মরজগৎ থেকে। কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনায় যে কীর্তিসৌধ গড়ে তুলেছিলেন তিনি কালের কুটিল দৃষ্টি এড়িয়ে আজও তা দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গ তথা ভারতের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে অভ্রংলিহ নগাধিরাজের মহিমায়।

[তথ্য সূত্র : কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী : নবদ্বীপ মহিমা, পূর্ণচন্দ্র দে : কালভট্ট শিরোমণি ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি : রঘুনাথ শিরোমণি— সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (একাদশ ভাগ) ১৩১১, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সারস্বতচর্চা]

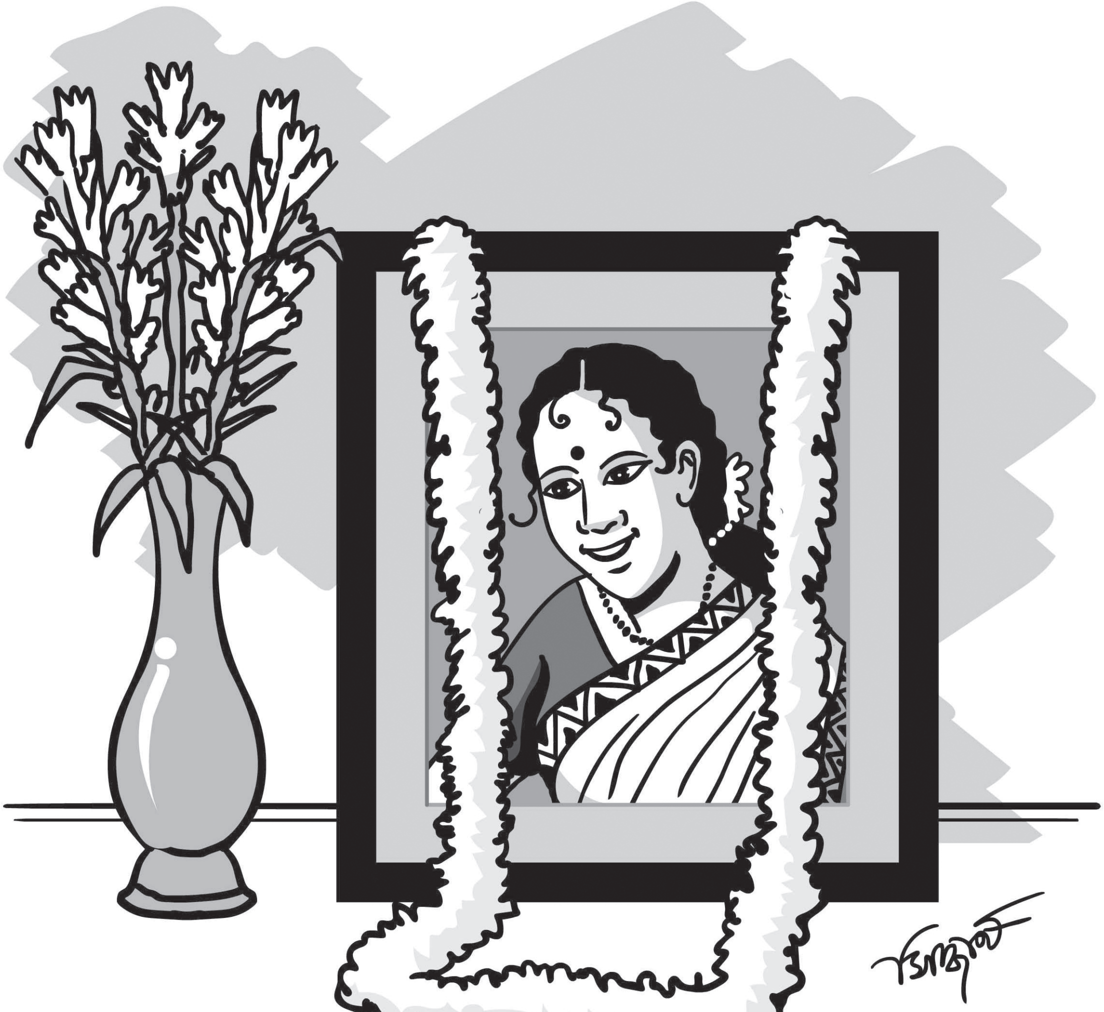

জন্মান্তর

মৌ চৌধুরী

ইন্দ্রনীল গত রাতে ভালো করে ঘুমাতেই পারছিল না। বুকের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। গ্যাস হয়েছে ভেবে ওষুধ খেল কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। তনুশ্রী পাশেই ঘুমাচ্ছে। বেশ অনেকদিন থেকেই তনুরও ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল, এখন ডাক্তারের পরামর্শ মেনে ঘুমের ওষুধ নিচ্ছে।

কিছুদিন আগে থেকেই ইন্দ্র আর তনুর জীবনে বিশাল ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে। সব কিছু মানিয়ে নিতে দুজনেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবে কষ্টটা তনুই বেশি পেয়েছে। ছন্দপতনটা ওদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। কিছুতেই ছেলের কথা ওরা ভুলতে পারছে না। চোখের জল যেন বাঁধ মানে না। একমাত্র ছেলে বিয়ে করে ওদের জীবন থেকে একেবারে চলে যাবে এমনটা কতজন মা-বাবা মেনে নিতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতে ইন্দ্র ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই কবে থেকে

সকালে ওর ঘুম ভাঙে তনুর গান শুনে। আজ কী হলো সব চুপচাপ। জানালার বাইরে ইন্দ্র তাকিয়ে দেখল বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। আজ কি তনু ঠাকুর ঘরে যায়নি? গত তিনমাস ধরে তো এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। সকালে উঠে স্নান সেরে বাগানে গিয়ে ফুল তুলে পূজা করতে বসে। আজ কী হলো। তবে কি তনু বাইরে গিয়েছে, এমনটা তো হওয়ার কথা নয়।

এরকম অনেক চিন্তা ঘনাতেই কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দরজার দিকে এগুলো ইন্দ্র। ভাবল তনু কি ফিরে এলো? দরজা খুলে দেখে ওদের বাড়ির কাজের মেয়ে রূপা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ঝড়ো গলায় বলল, সেই কখন থেকে বেল দিচ্ছি কাকু, তোমরা কী করছ? কাকিমা কোথায়, বাইরের গ্রিল খোলা কেন? দরজাও তো খোলা। ইন্দ্র বলল, আমিও তো তোর কাকিমাকে খুঁজছি। রূপাও অবাক ভাবে জানতে চাইল কোথায় গিয়েছে। ইন্দ্র হতাশ গলায় বলল, জানি না রে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর কাকিমার শরীর এতো খারাপ যে কখনও একা কোথাও যায় না। কী হলো বলত। কথা শেষ করার আগেই বারন্দায় এলো ইন্দ্র।।

শূন্য চোখে বাইরেটা দেখছিল ইন্দ্র। হঠাৎই ওদের কাছ থেকে দূরে যাওয়া ছেলে পিকলুর মুখটা মনে পড়ল। ওদের একমাত্র সন্তান পিকলু জানেও না ওর মা সকাল থেকে বাড়ি নেই। একবার ভাবল ছেলেকে ফোন করবে। অনেক দিন হয়ে গিয়েছে পিকলুকে ওরা নিজে থেকে ফোন করে না। ছেলে ফোন করলে কথা হয়। ইন্দ্রের মনে পড়ল গতমাসে অফিসের কাজে এসে পিকলু কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি এসেছিল। সেইদিন তনু চিংড়ি রান্না করেছিল। ভাত মেখে ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছিল মা। এমন সময় পিকলুর বউ শ্রেয়া ফোন করে ইন্দ্রকে যা নয় তাই শুনিয়েছিল। কেন পিকলু খেতে বসেছে এই কারণে। ওদের রান্নার মাসি রেঁধে দিয়ে গিয়েছে সেগুলো কী হবে। ইন্দ্র ফোনেই হাসিমুখে বলেছিল, রাগ কোরো না মা, পিকলু খেয়ে নেবে। এখানে তো অল্প খেল।

এসব ভাবছিল এরই মাঝে রূপা এসে ডাকল, ঘরে এসো কাকু, চা খেয়ে নাও, কাকিমা চলে আসবে বেশি ভেবো না। ইন্দ্র কী করবে বুঝতে পারছিল না। রূপাকে বলল, তুই তো এখন ও পাড়ার দত্তবাবুর বাড়িতে যাবি। যাওয়ার সময় আমাদের পরিচিত বাড়িগুলো একটু দেখে যাবি।

রূপা উত্তর দিল, নাগো কাকু, দত্তজেঠুরা তো ওদের মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে। সেখান থেকে মেয়ের বাড়িও যাবে। কয়েক দিন পরে ফিরবে। ওরা মেয়ের বাড়ি গেলে তো আসতেই চায় না। কাকিমা তো সব জানে। রূপা ইন্দ্রকে চা দিয়ে বলল, কালকেই বিকেলে তো কাকিমা বলেছিল ওনার হাতের ব্যথাটা বেড়েছে। আজকে আমার অন্য বাড়িতে কাজের চাপ কম তাই তোমাদের সকালের খাবারের জন্য রুটি-তরকারি করে দেব। তুমি একটু বসো কাকু, আমি খাবারটা করে দিই। তুমি খেয়ে নিও। আমি চলে যাওয়ার পর কাকিমা এলে অবশ্যই ফোন করো।

এ সবের মধ্যেই উদ্বেগ বেড়েই চলেছে ইন্দ্রর। একবার খবরের কাগজ নিয়ে বসল কিন্তু মন অস্থির লাগছে। কাগজটা ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে রাখল। হঠাৎ মনে হলো তনুকে ফোন করলেই তো হয়। রিং হলো, একবার মনে হলো বাড়িতেই বাজছে। দু'তিনবার রিং করল কিন্তু কেউ ধরছে না। ফোনটা কি ঘরেই রেখে গিয়েছে তনু? উদ্বেগটা এবার আতঙ্কে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। তনু না বলে কোথাও যায় না, এমনকী একাও যায় না।

ইন্দ্র এবার ঠিক করল তপনকে একটা ফোন করবে। ইন্দ্রর ছেলেবেলার বন্ধু তপন আর ওর বউ রীনা। বয়েসে রীনা ছোট হলেও ওদের দুটো পরিবার খুবই ঘনিষ্ঠ। খুব ছেলেবেলায় মা বাবা হারানো রীনা ওর মামার কাছেই মানুষ। ইন্দ্রদের পাড়াতেই রীনার মামাবাড়ি। সেই সুবাদে রীনার মামিকে ইন্দ্র মীরা কাকিমা বলে ডাকত। অবাধ যাতায়াত ছিল সেখানে। স্কুলের উঁচু ক্লাস থেকেই তপন আর রীনার প্রেম। মামা-মামির স্নেহ-ভালোবাসা প্রথম থেকেই পেয়েছিল রীনা। সব মিলিয়ে তপনদের বিয়েটা ভালোভাবেই হয়েছিল। তপনের ওষুধের ব্যবসা। অল্প বয়েসেই তপনের বাবা ক্যান্সারে মারা যান। তাই বাবার ওষুধের ব্যবসা হাতে নিতে হলো। তপন-রীনার কোনও সন্তান নেই। পিকলুকে ওরা খুব ভালোবাসে। কিন্তু পিকলুর এই মা-বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া ওদেরও বেদনা দিয়েছে। তপন বলে ওদের সন্তান নেই বলে এখন আর কষ্ট পায় না। তপনদের কথা ভাবনার ভেতরেই তনুর জন্য ভীষণই উদ্বেগ হচ্ছিল ইন্দ্রর। ছেলের বিয়ের পরে পরিস্থিতির চাপে তনু আর ইন্দ্রর নৈকট্য যেন আরও বেড়েছে। নির্ভরতা অনেক গভীর হয়েছে।

পিকলুর বিয়েটা সম্বন্ধ করেই হয়েছিল। বিয়ে পাকা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ছেলে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। বিয়ের আগে থেকেই শ্বশুরবাড়ি ছিল ধ্যানজ্ঞান, সেখানেই পড়ে থাকত। এই নিয়ে কোনও কথা বললেই অকারণে অশান্তি করত পিকলু। তনুর দিকে তেড়ে যেত। ইন্দ্র ও তনুকে অপমান করত। ইন্দ্র ভাবে কী যে দুর্বিষহ দিনগুলো কেটেছে। এর পেছনে ইন্ধনের বিষয়টি বুঝত ওরা। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ছেলেকে বড়ো করা, সঠিক দিশা দেখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার পর ছেলে এখন দূরে সরে গিয়েছে। তনু বলে ছেলের মা হয়ে কত যেন পাপ করেছি। এই ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। ছেলের পড়ার খরচ জোগাতে বাড়ি বাড়ি জামাকাপড় বিক্রি করেছি, কাজের লোক রাখিনি।

গত তিনমাস ধরে ছেলের জন্য সব সময় চোখের জল মুছত তনু। ইন্দ্র ভাবে,

সময় কি সত্যি বদলে গিয়েছে? এগিয়ে যাওয়া মানে কি সম্পর্কের অর্থ পালটে যাওয়া? বিয়ের পর মেয়েপক্ষ ধরেই নেয় জামাই এখন তাদের সম্পদ। অথচ পিকলুর বিয়ের আগে ওর শাশুড়ির হাত ধরে কতবার তনু বলেছে, আপনারা হলেন আমাদের পরম আত্মীয়। আমরা দুটি পরিবার একসঙ্গে থাকবো। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে ভালো থাকে আমরা দেখব। ওরা ভালো থাকলে আমারাও ভালো থাকব। এখন ইন্দ্রর এসব কথা ভাবলে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। বিশেষ করে ওর বিয়ের পরের দিনের সব কিছু মনে পড়লে অসম্ভব কষ্ট হয়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। পিকলুর জেদের জন্য ওর শ্বশুরের দেওয়া ফ্ল্যাটে তনুকে বধূবরণ করতে হয়েছিল। ছেলের শ্বশুর বাড়িতে ছেলের বউকে বরণ করার নজির বুঝি নেই। সেদিন ওখানে মিনিট পনেরো ছিল ইন্দ্র তনু আর তপনরা। সেখান থেকে বেরিয়েই বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তনু। এমন কান্না কোনও মা মনে হয় কাঁদেনি কখনও। সেদিন সর্বহারা মায়ের কান্না বিধাতাপুরুষ শুনেছিল কিনা ইন্দ্র জানে না। পিকলুকে ওর মা বারবার বলেছিল বরণ বাড়িতেই হোক তারপর চলে যাস। তোর শ্বশুরের দেওয়া ফ্ল্যাটে গিয়ে বরণ করার কষ্টটা দিস না। কিন্তু ছেলে শোনেনি। উলটে পিকলু বলেছিল আমি যা বলব চুপচাপ শুনে করে যাবে, কোনও কথা বলবে না। আমার কথাই শেষ কথা।

পিকলু প্রথম থেকেই শান্ত কিন্তু ওর এই আচরণের পরিবর্তনটাকে মেলাতে পারে না, মেনে নিতে পারে না ইন্দ্র। এসব ভাবতে ভাবতে আর প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে রাস্তায় কখন নেমে এসেছে ইন্দ্র খেয়ালই করেনি। হঠাৎ নিজের নাম শুনতে পেয়ে সম্বিত ফিরে পায় ও। তাকিয়ে দেখে পাড়ার বন্ধু দিবাকর তাকে ডাকছে। দিবাকর কাছে এসে বলল, কীরে কী হয়েছে তোর, চোখ মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন। কোথায় যাচ্ছিস। ইন্দ্র কী বলবে ভেবেই পাচ্ছে না। দিবাকর বলেই চলেছে, কাল তোর ছেলে আর বউমাকে দেখলাম হাতিবাগানে। আমি ডাকলাম, দেখেও কথা বলল না। মুখ ফিরিয়ে নিল। অথচ আগে দেখলে কত কথা বলত। কত অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। দুঃখের গলায় দিবাকর বলল, জানিস তো ইন্দ্র, আমার মেয়ে সিকিম বেড়াতে গিয়েছিল। তখন তোর ছেলেও ওখানে ছিল। ওদের দেখা হয়েছিল কিন্তু পিকলু কথাই বলেনি। আমার মেয়েকে তো পিকলু কিছুদিন পড়িয়েছিল। আমাদের বাড়িতে আসত, এখন কত পালটে গিয়েছে। এবারে দিবাকর ইন্দ্রর হাত ধরে বলল ইন্দ্র তুই ভাবিস না ভাই, সব ঠিক হয়ে যাবে। জানিস তো আমরা তোদের কথা খুব বলি। খুব খারাপ লাগে তনু বউদির জন্য।

খুবই আন্তরিকভাবে দিবাকর কথাগুলো বললেও কোনও কারণ ছাড়াই ইন্দ্র একটু রেগে গেল। স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে কিছুটা কটু গলায় বলল, হ্যারে দিবা, শুনলাম তোর জামাই নাকি তোর বাড়িতেই থাকে। তোর মেয়ে নাকি শ্বশুর বাড়ি যায় না। তোর বাড়ির উপর তলায় ওদের থাকার জন্য বেআইনিভাবে ঘর করে দিয়েছিস। এর জন্য পার্টি নেতাকে টাকা দিতে হয়েছে। আর তোর নামে জামাই গাড়ি কিনেছে। দিবাকর খুব অবাক হয়ে বলল, তোর কী হয়েছে রে, বলত। আমি তোকে খোঁচা দেওয়ার জন্য বলিনি রে। আর তুই তো কখনও এমন করে কথা বলিস না। শান্ত হ' ইন্দ্র।

দিবাকরের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র ভাবছিল সত্যি তো তার মতো শান্ত মানুষ এসব কী বলে ফেলল। আসলে ছেলের কথা মনে করে সব সময় মাথা গরম থাকে,তার উপর আজ সকাল থেকে তনুর বাড়ি না থাকা, সব মিলিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলেই পিকলুর আলোচনা চলে আসে। ভালো লাগে না কিছুই। ইন্দ্র ভাবছিল কবে যে পিকলুর চৈতন্য হবে। মাঝেমাঝে ভাবে সে বা তনু অসুস্থ হলে কে দেখবে। জটিল অসুখ হলে হাসপাতালে ভর্তি হলে কী হবে। বয়েসের কারণে ইন্দ্র বা তনু কেউই আর সেভাবে সক্ষম নয়। এখন পরিস্থিতি এমনই যে ছেলে চাইলেও ইন্দ্রদের কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ছেলে, ছেলের বউ আলাদা থাকবে একথা কখনও ভাবেনি তনু। এখনকার প্রজন্মের শাশুড়িরা তাদের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থাকবে ভাবতেই পারে না। পিকলুর বউ শ্রেয়া মন্তব্য করে, ছেলের মা-বাবা ল্যাংবোর্ড। পিকলু তো বলেই ফেলে তার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তনুদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব।

পিকলু একটা সময় চরম অত্যাচার করেছে। বিয়ের আগে থেকেই রোজ বিকেলে শ্বশুরবাড়ি চলে যেত। সেখানেই প্রায়ই থাকত। এই নিয়ে কিছু বলতে গেলেই চরম অশান্তি শুরু হয়ে যেত। বিয়ের পরে তো সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে একেবারেই চলে গেল। পিকলুর ফেলে যাওয়া জামাকাপড়, বই রোজই নানাভাবে গুছিয়ে রাখত তনু আর অঝোর ধারায় কাঁদত। সাংসারিক জীবনে অবহেলা এনে ফেলছিল তনু। এমন হয়েছিল যে রান্নাঘরে যেতে চাইত না। সবসময় কাঁদত, কেন কোন পাপে এমন জীবন হল?

এসব ভাবতে ভাবতে তনুর জন্য চরম উদ্বিগ্ন মনে তপনের বাড়ি ছুটে এল ইন্দ্র। এই সময়ে আর কারও কথাই ভাবতে পারেনি সে। বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল রীনা। খুব খুশির গলায় তাকে ভেতরে ডাকল রীনা। ইন্দ্র জানতে চাইল তপন নেই বাড়িতে? রীনা কিছুটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানালো, তপন বাড়ি নেই। তাদের বাড়ির কাজের বউ শেফালিকে নিয়ে থানায় গিয়েছে। শেফালির মেয়ে মায়াকে গত রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দ্রকে বসতে বলে রীনা জানালো, গতকাল একটি রাজনৈতিক দলের মিছিলে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা আর খাবার দিয়ে লোক নিয়ে

গিয়েছিল। সেই দলে মায়াও ছিল। সবাই ফিরে গেলেও মায়া ফেরেনি। সে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। ইন্দ্র দেখেছে মায়াকে। বেশ চটকদার চেহারা। এবার ইন্দ্রও চিন্তিত হলো। রীনা বলল, কী খবর ইন্দ্রদা কেমন আছেন, তনুদির পূজা চলছে এখনও? এবারে বাঁধ ভেঙে গেল ইন্দ্রর। কান্না ভেজা গলায় বলল, আজ সকাল থেকে তনুকে পাচ্ছি না। কোথায় গিয়েছে জানি না। ভাবলাম তোমাদের বাড়িতে যদি আসে। রীনা প্রায় আর্তনাদ করে বলল সে কী কথা ইন্দ্রদা। সবাইকে জানিয়েছ, পিকলু জানে। মাথা নেড়ে না করল ইন্দ্র। বিপর্যস্ত গলায় বলল, কাউকে বলিনি। কী করব জানি না। তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমি তনুকে ফোন করেছিলাম। রিং হলো কিন্তু ধরেনি। ফোনটা বাড়িতেই কিনা বুঝতে পারছি না। রীনা বলল দাঁড়াও আমি ফোন করছি। এবারেও একই ব্যাপার। ফোন বেজেই যাচ্ছে। রীনা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কী হলো বলো তো। আচ্ছা ইন্দ্রদা, তোমরা ঝগড়া করোনি তো। তোমাদের মানসিক অবস্থা যা যাচ্ছে তাতে অসম্ভব কিছু নেই। অনুযোগের সুরে রীনা বলল, এখন কোথায় দুজনে একটু শান্তিতে থাকবে তা নয়। তুমিও তনুদিকে যথেষ্ট আঘাত দিয়ে কথা বল। যাই হোক তপনকে ফোন করছি। তুমি পিকলুকে এখনই জানাও। ইন্দ্র বলল— রীনা, পিকলুকে এখনই জানাতে চাই না। ওর মা মরল কী বাঁচল তাতে ওর কী? রীনা থামিয়ে দিয়ে বলল, এই ভুলটা করো না। ছেলের উপর আপনাদের হাজারবার অধিকার আছে। যে ছেলে সারাদিন বই মুখে নিয়ে থাকত, একটাও গার্লফ্রেন্ড ছিল না। তাকে কে তুলে নিল আর তোমরা অভিমানে সরে গেলে, তাই কখনও হয়! ইন্দ্র বলল, তোমরা তো সবই জান, নিত্য অশান্তি আর ভালো লাগছিল না। রীনা বলল, সব সত্যি। ছেলেটা একটা অন্ধ মোহে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় বাইকের শব্দ রীনাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। রীনা বলল ওই তো তপন এসে গিয়েছে। কিন্তু দরজা খুলেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল রীনার। দেখল, শাসক দলের উঠতি মস্তান নেতা গোপাল। বাবা বাজারে তরকারি বিক্রি করত আর নিজে টোটো চালাত, তার এখন সীমাহীন টাকা। লেখাপড়া শেখেনি। পরনে সাদা পাজামা শার্ট , গলায় মোটা চেন, হাতে একগাদা আংটি। ভেতরে ইন্দ্রকে দেখে হাড় জ্বালানো হাসি হেসে বলল, মাইরি বস, আপনার ভাগ্য বহোত ভালো। মালদার বেয়াইন পেয়েছেন। ইন্দ্র রেগে ওঠার আগে রীনা বলল তপন বাড়ি নেই, পরে এসো। বলেই দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে গোপাল বলল, মাইরি ভেতরে খেলা জমেছে।

আজকের দিনটা সত্যি মন্দ ইন্দ্রর। হঠাৎ করে সব রাগ গিয়ে পড়ল সেই সকাল থেকে হারিয়ে যাওয়া তনুর উপর। সেই সঙ্গে একটা কান্না গলায় আটকে রইল। কোথায় গেল তার জীবনের সাথী। বড্ডো অভিমানী তনু। ইন্দ্রর সঙ্গে রাগারাগি হলে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিত। সংসারের সব ঝক্কি নীরবে সামাল দিলেও খেত না। দুবার অসুস্থও হয়েছিল। এসব ভাবনার মাঝেই পাড়ার সকলের মানুপিসির গলা পেল ইন্দ্র। গোলগাল ভারিক্কি চেহারা। এর কথা তাকে লাগানো কাজ। সবাই সমঝে চলে। মানুপিসি যে এসো এসো, রীনা সমাদর করে পিসিকে ডেকে নিয়ে এলো। মানুপিসি জানিয়ে দিলেন তার এখন বসার সময় নেই, বিকেলে তার সদ্য জন্মানো নাতির ঘরে পুতির ছয়ষষ্ঠী, সেই নেমতন্ন করতেই আসা। নাতির ছেলে বলে কথা, আনন্দে ডগমগ পিসি। ঘরে বসা ইন্দ্রর দিকে চোখ পড়তেই বললেন, তুই কেমন আছিস রে। তোর বউটাকে বিকেলে পাঠিয়ে দিস। তারপর তোর ছেলে-বউমার কী খবর রে। বাড়ি আসে টাসে তো? এখনকার ছেলেপুলেরা কেমন যে ধারা বুঝি না। একটেরে কথা বলে চলেন মানুপিসি। আমাদের বাড়ির বউগুলোকে এখনও বশে রেখেছি রে। আমার বড়ো ছেলে নান্দুর বউয়ের কথাই ধর, নিজে শাশুড়ি হয়ে গেল কিন্তু এখনও আমাদের সবাইকে কেমন মান্যি করে। আমার বাড়ির তিন ছেলের বউ সকলের কত মিলমিশ। এখন যাই রে, অনেক কাজ। এতসব কথা ইন্দ্রকে স্পর্শই করছিল না। তনুর কথা ভাবতে গিয়ে চোখে জল চলে আসছে।

ইন্দ্রর মন ভালো করার জন্য রীনা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, আগেকার দিনগুলো কত ভালো ছিল বলো। আমাদের পাড়াটাই ছিল একটা পরিবার। মনে আছে আমাদের পাড়ার শোভাপিসি, মান্তুপিসি, কাবেরী পিসি, বিল্টু কাকু, কত হইচই, আনন্দ। এত কষ্টের ভেতর ইন্দ্রর একটা ঘটনা মনে পড়ল। বিল্টুর বিয়ের সময় কাবেরীপিসি আর শঙ্করকাকুর একসঙ্গে ঘুমানো নিয়ে বড়োদের ভেতর কত ফিসফাস শুনেছিল। শঙ্করকাকু ইন্দ্রর হাত দিয়ে কাবেরী পিসিকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। ঘুষ হিসাবে সে পেয়েছিল চকোলেট। সেই কাবেরী পিসি আত্মহত্যা করেছিল। কারণটা তখন না বুঝলেও পরে বড়ো হয়ে জানতে পেরেছে ইন্দ্র।

কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্র। মানুপিসির ডাকে সম্বিত ফিরে এলো। শোন, তোর ছেলেকে কালাজাদু করেছে তোর বেয়ান, তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে কাটা। এসব শুনে প্রচণ্ড বিরক্ত ইন্দ্র। এমনিতেই উৎকণ্ঠায় স্থির থাকতে পারছে না ও, তার উপর কালা জাদু। আপাতসুখীরা অন্যের কষ্ট নিয়ে আনন্দ পায়। মানুপিসি এবারে সরাসরি ইন্দ্রর কাছে জানতে চাইল, তোর কাজের মেয়ের কাছে শুনলাম তোর বউ নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গ্যাছে। কী রে? রীনা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, না না এমনি সকালে হাটতে গিয়েছিল তনুদি। ও তাই বল, বলে বেরিয়ে গেল মানুপিসি।

এবারে আর থাকতে পারল না ইন্দ্র। উঠে পড়ল। রীনা আটকাল, এখনই কোথায় যাবে। দাঁড়াও, আগে ফোন করি

তারপর যাবে। রীনা প্রথমেই ফোন করল পিকলুকে। সে খবরটাতে কতটা গুরুত্ব দিল ইন্দ্র বুঝতে পারল না। তারপর দুজনে অনেক জায়গায় অনেক ফোন করেও তনুর কোনও খবর পেল না। ইন্দ্র এবার বেরিয়ে এলো। তারপর এলোমেলো মন নিয়ে চলে এল স্টেশনের কাছে। বারবারই ওর মনে হচ্ছে তনু চলে যেতে পারে ওর সোনা জেঠিমার কাছে। তনুর সোনা জেঠিমার বাড়ি কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে, রায়নগরে। অনেকটা জায়গাজমি আছে। রাজনৈতিক কারণে জ্যাঠামশাই অনেকদিন আগে খুন হয়ে যান। তনু বলে, সোনা জেঠিমা তার প্রাণের আরাম, মনের শান্তি। তনুও ছিল তার প্রাণের ধন। মন খারাপ হলেই তনু চলে আসে এখানে। সোনা জেঠিমা হাইস্কুলে পড়াতেন।

ইন্দ্র রায়নগরে এসে পৌঁছালো অনেক বেলায়। বিপর্যস্ত চেহারায় ইন্দ্রকে দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন সোনা জেঠিমা। তনু এখনেও নেই জেনে মাটিতে বসে পড়ল ইন্দ্র। সোনা জেঠিমা বুকফাটা কান্নায় মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন। এত বড়ো ধাক্কা নিতে পারেননি সোনা জেঠিমা। চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিন তিনেক হাসপাতালে লড়াই করেও ফিরে এলেন না। ইন্দ্র ভাবে, সোনা জেঠিমা আর তনুশ্রীর বন্ধন নিয়ে কত কথা হতে পারে। ভালোবাসা কাকে বলে ওদের দুজনকে দেখলে জানা যায়।

না, তনুশ্রী আর ফিরে আসেনি। ইন্দ্র ভাবে এই বিশ্ব সংসারে এত মানুষের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেল তনু। কত খুঁজেছে তনুকে, পিকলুও অনেক খুঁজেছে কিন্তু মায়ের দেখা পায়নি। পুলিশ অকারণে কত বেওয়ারিস দেহ দেখিয়েছে। প্রথম দিকে খুব ভাবত ইন্দ্র এই বুঝি ফিরে এল তনু। অকারণে দরজা খুলে শূন্য বাতাসের হাহাকার শুনেছে।

সময়ের সঙ্গে তনুশ্রীর ফিরে আসার আশায় একযুগ, বারোটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে। যেন এক জন্ম কেটে গিয়েছে। এই জন্মান্তর পর্বে ইন্দ্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। জীর্ণ অসুস্থ মন ভারাক্রান্ত অবিশ্রান্ত মৃত্যু কামনায় এক বৃদ্ধ। এই জীবনে তনুশ্রীর সঙ্গে কখন কবে খারাপ ব্যবহার করেছে সে সবই মনে পড়ে তার।

শাস্ত্র অনুসারে আজ তনুশ্রীর পারলৌকিক কাজ। বারো বছর কেউ নিরুদ্দেশ থাকলে ধরে নেওয়া হয় সে মৃত। পিকলু সব আয়োজন করেছে। তনুর হাতে সাজানো বাড়িটা আর নেই। অনেক আগেই পিকলুর বউ বিক্রি করে দিয়েছে।

ইন্দ্র বাধা দেয়নি। এখন সে ছোটো এক কামরার ঘরে থাকে, সম্পূর্ণ একা। ইচ্ছে হলে খায়। আগে ইন্দ্রের মুখ দেখেই তনু বুঝে নিত তার ক্ষিদে পেয়েছে কিনা। ইন্দ্র ভাবে পূর্বজন্মের সুখের দিন যদি একবার ফিরে আসত। সেই নিজের বাড়ি যেখানে পিকলু হামাগুড়ি দিচ্ছে, তনু নিজের হাতে সংসার ধরে আছে, কেবলই সুখ।

আজ সকাল থেকে সকলের ব্যস্ততা। গতকাল পিকলু নিজের ফ্ল্যাটে ইন্দ্রকে নিয়ে এসেছে। কালই আবার চলে যাবে। বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে পিকলুর একটি ছেলে হয়েছে। সে এখন স্কুলে যাচ্ছে। নিজের উত্তরাধিকারের দিকে তাকিয়ে কোনও আশা জাগে না ইন্দ্রের মনে। শ্রাদ্ধবাসরে তনুশ্রীর অল্পবয়সের ছবিতে মালা পড়ানো। কোনও ত্রুটি রাখেনি পিকলু। বরং প্রাচুর্যে পূর্ণ। হাকডাক করে লোক দেখানো তদারকি করছে পিকলুর শ্বশুর। গীতাপাঠ চলছে—'বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি সংযাতি নবানি দেহী'।। গীতা পাঠ এত মন দিয়ে আগে শোনেনি ইন্দ্র। বুকের ভেতর একটা বিরাট ধাক্কা লাগল। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মাও দেহ বদল করে। হঠাৎ ভাবলো, আচ্ছা পিকলুর ঘরে কি তনু ফিরে এলো? পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিল ইন্দ্র। তাকিয়ে দেখল শ্রাদ্ধবাসরে রীনা তপন তো আছেই, পুরনো পরিচিত কাছের অনেকেই এসেছে। ইন্দ্র বুঝল পিকলু সবাইকে আসতে বলেছে। সকলেই তনুর প্রতি ভালোবাসার টানে এসেছে। কেউ তনুর হারিয়ে যাওয়াটাকে মানতে পারেনি। সকলেই এর জন্য পিকলুকে দোষারোপ করেছে। ইন্দ্র দেখল পিকলর বউ সবাইকে আপ্যায়ন করে খেতে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রর নাকে ধূপ আর রজনীগন্ধার গন্ধ ছাপিয়ে বিয়াল্লিশ বছর আগের স্মৃতিতে চলে যাচ্ছিল। বছর বাইশের ছিপছিপে শ্যামবর্ণা প্রাণবন্ত মেয়ে তনুশ্রীকে ঘরে এনেছিল ইন্দ্র। তাকে আদর করে বরণ করে নেওয়ারও তেমন কেউ ছিল না। সেই রাতে তনু মেখেছিল সস্তা সুগন্ধী। সেই গন্ধ যেন ভেসে আসছে। পরে নিজগুণে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল তনু। ভাবনার মাঝেই পিকলুর ছেলে হঠাৎ ছুটে এসে ইন্দ্রর গলা জড়িয়ে ধরল। খুব আদর করে খুশি গলায় বলল, চলো দাদাই, এসো আমার ঘরে, চলো আজ সারাক্ষণ ঠাম্মির গল্প শুনব। ক্ষিদে পেলে বলবে অন লাইনে অর্ডার দিয়ে দেব। এতক্ষণে একটু হাসি এল ইন্দ্র মুখে। অনলাইনে খাবার নিয়ে খুবই আপত্তি ছিল তনুর। ওর মতে অনলাইনে খাবার মানে শরীরের ক্ষতি, আবার অর্থ নষ্ট। পিকলু চাকরি পাওয়ার পর খুব অনলাইনে খাবার আনাত ,তাই নিয়ে রাগারাগি করত তনু। শ্রাদ্ধবাসরে তনুর ছবির দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রর মনে হলো সত্যিই কি তনু ইহলোকে নেই? কে এই নিয়ম তৈরি করেছে বারো বছর পেরিয়ে গেলে পারলৌকিক কাজ করতে হয়? এই বিশ্বমাঝে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে কেন মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়? ইন্দ্র সবসময় ভাবে কেন তনু হারিয়ে গেল। তনুর মনের কষ্ট সবাই জানে কিন্তু সেসবের থেকে কি বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল? সময় কি সব ঠিক করে দিতে পারত না? এখন তনুর সোনা জেঠিমার একটা কথা খুব মনে পড়ছে। তিনি বলতেন যারা মানুযের ক্ষতি করে তাদের কোনও বিচার হয় না।

কথার কোলাহলে ইন্দ্র মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে পিকলুর বয়েসি অনেকেই খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করল ওর পুরনো অসুখটা আবার দেখা দিচ্ছে, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, চোখে ঝাপসা দেখা, শরীর অস্থির হওয়া। এর আগে দুবার এমন হয়েছিল। এর জেরে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। জোর করে শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে নাতির হাত ধরে রইল। অনেকেই এসেছে কিন্তু ও খেয়াল করল পাড়ার শিবুজেঠা আসেননি। এক সময়ের সেনাবাহিনীর অফিসার, অনেক বয়েস হয়ে গেলেও সচল আর সকলের অভিভাবক তিনি। পিকলুর ছেলে হওয়ার পর খুব কুণ্ঠিত ভাবে একবার পিকলুর বাড়িতে নাতিকে দেখতে সামান্য সময়ের জন্য এসেছিলেন। একবার পিকলুর বাড়ির কাছে শিবুজেঠার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খুব বিরক্তভাবে তিনি বলেছিলেন, কী রে বাপের ভিটে তো বেচেই দিলি। পাড়ার মানুষগুলোও মন থেকে মুছে গেছে। এখন কি নাতির টানে সেই ছেলের বাড়ি যাচ্ছিস, যে তার মাকে একরকম খুন করেছে। একা থাক বুঝলি। যে সন্তান মায়ের নাড়ীর টানকে উপেক্ষা করতে পারে, অন্ধ মোহে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, নিজের অতীতকে ভুলে যায়, সে কীসের সন্তান বল? খুব রেগে গিয়ে শিবুজেঠা বলেছিলেন, তোর বউয়ের কথা মনে হয় না? তনুর মতো মেয়েই হয় না। সব ভুলে গেলি। আসলে এখনকার সমস্যাটা কী জানিস, লাজ লজ্জা বলে কিছু নেই, কাম আর মোহে সব অন্ধ। এই জেনারেশনের কাছে ভালোবাসা আর পারিবারিক বন্ধনের কোনও মূল্য নেই। ছেলেগুলো কুলাঙ্গার আর মেয়েগুলো স্বার্থপর। সংসার ভাঙতে জানে, গড়তে শেখেনি। সমাজের এই অবক্ষয় কে রোধ করবে জানি না।

এবারে শরীরটা খুব খারাপ লাগছে ইন্দ্রর। যেন বাতাসটাই নেই। খুব শক্ত করে নাতির হাতটা ধরে রইল। খুব আকুল গলায় নাতি বলল, তুমি কাঁদছ কেন দাদাই? জানো তো, বাবা একবার ঠাম্মির জন্য খুব কেঁদেছিল। একি দাদাই, তুমি মাটিতে শুয়ে পড়লে কেন? নাতির ঝাঁকুনি আর চিৎকারে একটু যেন চেতনা ফিরে এল ইন্দ্রর। মাথা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে আছে। তারপরেই পিকলুর কান্না ভেজা আকুল আর্তনাদ শুনল, বাবা ও বাবা, কী হয়েছে, কথা বলছ না কেন। এই আকুল ডাকটাই কি পরম শান্তিতে নবজন্মের সূচনা করল সব হারানো এক বাবার, হয়তো-বা তনুশ্রীর সঙ্গে মিলন ইন্দ্রনীলের। ❑